DUAFI
DHAKA UNIVERSITY ALUMNI FORUM INC
DUAFI Biennial Reunion 2024

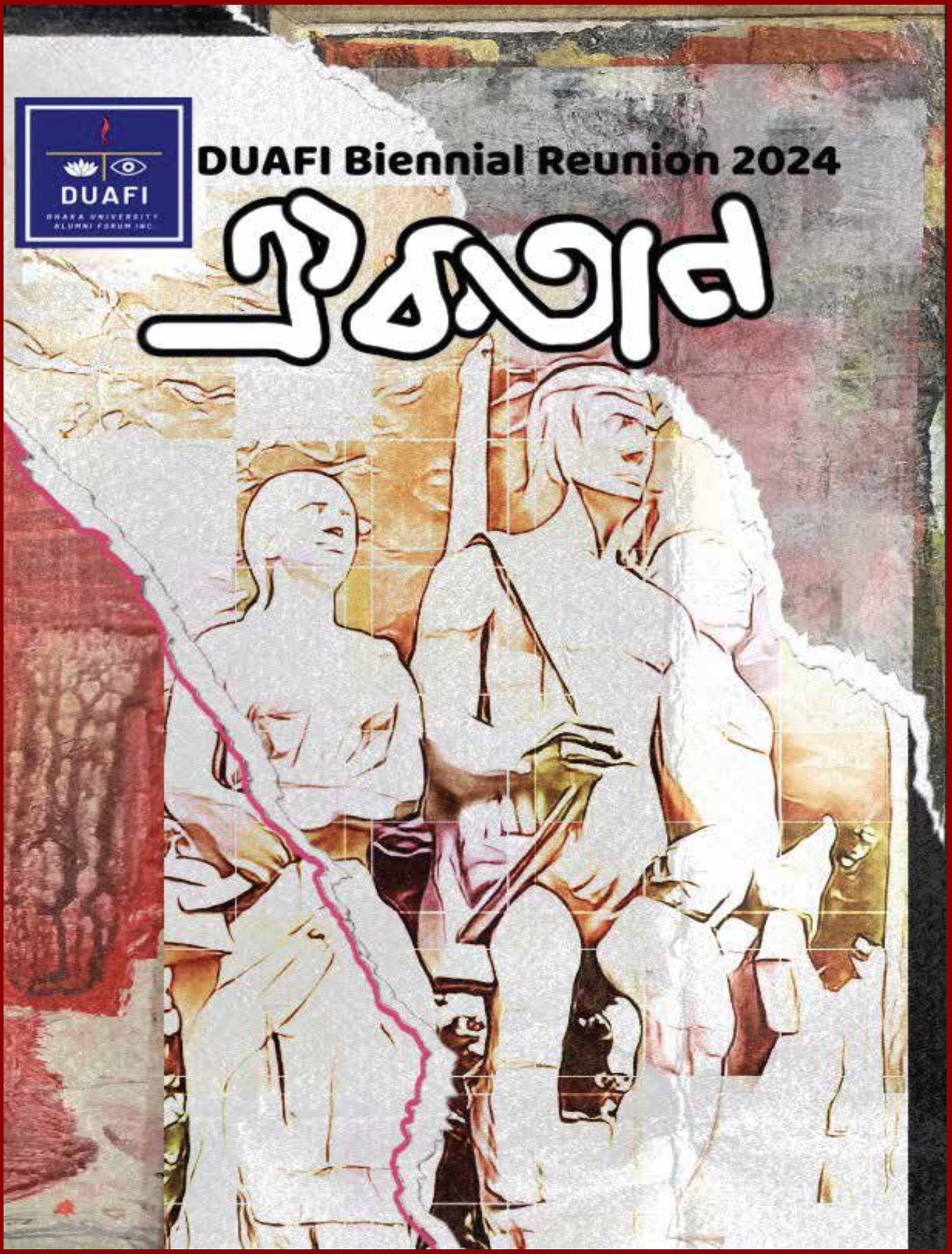

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই ফোরাম, ইন্‌ক (ডুয়াফি)
এর দ্বিবার্ষিক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সবাইকে
স্বাগতম ও শুভেচ্ছা!

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের গর্ব, জাতীয় ইতিহাসের অংশ। প্রবাসের মাটিতে শেকড়ের টানে আমাদের অন্তর জুড়ে প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আজকের এই আনন্দঘন পুনর্মিলনী আয়োজনে সবার সান্নিধ্যে মনের গভীরে গুঞ্জরিত হচ্ছে.....

*"পুরানো সেই দিনের কথা*
*ভুলবি কিরে হায়*
*ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা*
*সে কি ভোলা যায়"*

DUAFI
DHAKA UNIVERSITY ALUMNI FORUM INC.

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই ফোরাম, ইন্‌ক (ডুয়াফি)

https://www.duafi.org/

**Date : December 7, 2024**
**Venue : Margaret Schweinhaut Senior Centre,** 1000 Forest Glen Road, Silver Spring, MD 20901

# একতান

বিশেষ স্মারক সংকলন
ডুয়াফি দ্বিবার্ষিক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান ২০২৪


**Editor-in-Chief**
Anthony Pius Gomes

**Editorial Board Members:**
Dr. Shoaib Chowdhury
Dr. Mizanur Rahman
Sultana Yeasmin Shoma

**Special Acknowledgement:**
Boad of Directors, DUAFI

**Cover Design:**
Sunil Sukla

**Compose and Graphics Design:**
M. M. Afzal Baky

**Printing:**
Rashed Ahmed
AlphaGraphics Printing
7426 Alban Station Blvd Suite A-101,
Springfield, VA 22150.
Phone: (703) 866-1988 / 571-438-2169

**Published by:**
Dhaka University Alumni Forum,Inc. (DUAFI)
Maryland, DC. & Virginia

**Published on:**
December 07, 2024


https://www.duafi.org/

## Table of Contents


| | |
|---|---|
| Editorial Board | 02 |
| Editorial | 03 |
| President's Message | 04 |
| President-Elect's Message | 05 |
| Secretarial Report | 06 |
| DUAFI Current Board | 08 |
| DUAFI New Board | 09 |
| DUAFI Election Commission 2024 | 09 |
| DUAFI History | 10 |
| **Articles:** | |
| Partitioning of India Was A Disastrous Event | 12 |
| স্বকথনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্য চর্চা ১৯৫১-১৯৬১ | 14 |
| Nazu Khan- An Icon of Salimullah Muslim Hall | 20 |
| ওয়াশিংটনে প্রতিবছর ডুয়াফির পুনর্মিলনী হয়, হয় নানান অনুষ্ঠান | 22 |
| স্মৃতির বালুকাবেলায় | 26 |
| Bangladesh's Economy: Growth With Fault Lines | 29 |
| প্রফেসর কামাল | 35 |
| Results-based & Welfare-driven Research - Thoughts Outside The Box | 38 |
| হাঙেরীর বালাটন জলরাশি তীরে কবিগুরু | 41 |
| I Miss My Life at Dhaka University | 43 |
| A Real Conversation with Gerard – An Uber Driver | 46 |
| স্বপ্নভূক | 50 |
| 'গিভ-ব্যাক' করতে হবে আমাদেরই | 53 |
| Nuclear Warfare and Global Harmony | 55 |
| Reflection on this Year's US election | 60 |
| মিলিনিয়াম সমাবর্তন | 62 |
| How Atoms Work | 63 |
| **Poems:** | |
| শিরোনামহীন | 65 |
| When Poets Meet | 66 |
| অজাগ্রত আমি | 66 |
| টিমটিমে রং | 67 |
| অসময়ে মৃত্যু ভাবনা | 68 |
| তেত্রিশ বছর পরে | 69 |
| An Old Story | 70 |
| **DUAFI Albums** | 73 |

# Editorial Board

**Anthony Pius Gomes**
**Editor-in-Chief**

**Dr. Shoaib Chowdhury**
**Editor**

**Dr. Mizanur Rahman**
**Editor**

**Sultana Yeasmin Shoma**
**Editor**

## BOD Liaison to the Editorial Board

**Ahasan Kabir**

# সম্পাদকীয়

সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা! ডুয়াফি আয়োজিত দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের এই দিনটি আমাদের সবার জন্য একটি বিশেষ আনন্দের দিন, এ আমাদের ডুয়াফি পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে এক অনন্য মিলনমেলা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন আমরা সবাই পার করে এসেছি বহুদিন আগেই, তবুও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের আনন্দঘন বৈচিত্রময় আলোকিত সেইসব দিনগুলোর নানা স্মৃতি আমাদের হৃদয়ের গভীরে ভাস্বর হয়ে আছে। সম্মেলনের সূত্র ধরে সবার সান্নিধ্যে সেই সোনালী স্মৃতিগুলো যেন আরো বেশী করে মূর্ত হয়ে উঠে, আমাদের টেনে নিয়ে যায় অতীতের সেই দিনগুলোতে।

ওয়াশিংটন মেট্রো এলাকায় ডুয়াফি একটি বিশেষ সংগঠন হিসেবে পরিগণিত এবং সমাদৃত। সারা বছরব্যাপী আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি ডুয়াফি আয়োজিত এই দ্বিবার্ষিক সম্মেলন আমাদের একটি ভিন্ন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার স্পর্শে সমৃদ্ধ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়; আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি অংশ, শতাধিক বছরের ইতিহাস বুকে নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এই মহান বিদ্যাপীঠ। দেশে-প্রবাসে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্বিত প্রাক্তনী হিসেবে এই প্রিয় বিদ্যাপীঠের প্রতি আমাদের যে অকৃত্রিম ভালোবাসা ও হৃদয়ের টান, তা আমাদের এক ভিন্ন গ্রন্থিতে আবদ্ধ করে দেয়।

সম্মেলনের অন্যতম অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে 'ঐকতান' পত্রিকা, যেখানে আমাদের প্রাক্তনীদের লেখার সৌকর্য ও ভাবনার গভীরতা ফুটে উঠেছে স্বীয় মহিমায়। যারা এই পত্রিকার জন্য লেখা এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, প্রকাশনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের সবার প্রতি রইল আমাদের অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

সম্পাদনা পর্ষদ এর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ডুয়াফি কার্যকরী পরিষদের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এই প্রকাশনা সম্ভব হতো না কোনক্রমেই। তাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। যদি কোথাও কোন অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি থেকে যায়, আশা করি আপনারা তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

আমরা প্রায় বছরের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সমীকরণে সারাটি বছর যেভাবেই কাটুকনা কেন, আমরা আগামীর দিকে তাকিয়ে আছি নতুন এক স্বপ্নপূরণের আশায়। আগামী বছরটি সবার জন্য কাঙ্ক্ষিত অর্জনের স্পর্শে সাফল্যমন্ডিত হোক, সকলের জন্য আগামী দিনগুলো সুন্দর, শান্তিময় ও মঙ্গলময় হোক-এই শুভকামনা রইল।

**এন্থনি পিউস গোমেজ**
প্রধান সম্পাদক, "ঐকতান" ২০২৪
সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে

# President's Message

Welcome to the DUAFI Reunion 2024!

As my tenure as President of the Dhaka University Alumni Forum Inc. (DUAFI) comes to an end, I find myself reflecting on the incredible journey we have all shared together.

Over the past few years as a member of the DUAFI board, I have had the privilege of celebrating the numerous achievements of our vast alumni network. It has been an honor to contribute to the growth and success of DUAFI—fostering meaningful connections, supporting countless initiatives, and witnessing the expansion of our vibrant community. Whether through reunions, picnics, workshops, cultural programs, or simply celebrating the successes of our fellow alumni, these accomplishments were made possible because of your unwavering support and engagement. Each of you has played a vital role in strengthening our DUAFI network and ensuring its vitality for generations to come.

Together, we have upheld the values and traditions that make the DUAFI community so unique—a platform that enables graduates to forge meaningful connections among themselves. This shared spirit of fellowship and mutual support sets DUAFI apart and makes our network truly special.

As I pass the baton to our incoming President, Ishrat Sultana Mita, and the new Board of Directors, I am filled with hope and optimism for the future. I have no doubt that under her leadership, DUAFI will continue to thrive, innovate, and embody the spirit of our alma mater. Ishrat is deeply committed to advancing our strong alumni network, fostering collaboration, and creating new opportunities for personal and professional growth.

I extend my heartfelt thanks to the editorial board, our donors, participants, and especially my fellow board members, who have worked tirelessly to ensure the success and sustainability of our reunion and other DUAFI initiatives. Your dedication has been both inspiring and invaluable.

On a personal note, I would like to express my deepest gratitude to my wife, Afrin Fancy, and my son, Eshan, who have been instrumental in supporting me throughout this journey. Their encouragement and unwavering presence have made it possible for me to devote myself fully to DUAFI's mission.

Thank you all for entrusting me with this role, for your friendship, and for the cherished memories we have created together. I look forward to remaining an active member of this extraordinary community and witnessing all the amazing things we will continue to achieve.

It has been an honor and a privilege to serve this incredible DUAFI community.

Best regards,

**Dr. Abdul Quayum Khan**
President
DUAFI Board of Directors (2023–24)

# President-Elect's Message

**Dear Esteemed DUAFI Members**

As the President-elect for 2025-2026, I would like to extend my heartfelt gratitude to all members for placing their trust in us and electing the Board of Directors to run the highly prestigious Dhaka University Alumni Forum, Inc. (DUAFI) for the next two years. Over the past 12 years of active participation as a general member as well as a member of the Board of Directors, I have learned so much from each of you.

Whenever I spoke with a graduate, a spouse, or even our next generation—the DUAFI Kids—I was inspired by their fresh ideas, visions, and dreams for DUAFI. These conversations with DU alumni have revealed a rich tapestry of diversity, knowledge, aspirations, and depth of experience. Whether engaging with those who graduated before I was born or those who are the same age as my children, I have been struck by the common thread that binds us all: a deep, abiding love for our alma mater and a shared desire to see DUAFI thrive. This intergenerational camaraderie, to me, embodies the essence of DUAFI's success and is its greatest achievement.

Our organization is driven by a shared dream, a dream that goes beyond any individual's ambitions. It is the collective aspiration to reunite, to embrace, and to relive the joyous, carefree days of our youth. The strength of DUAFI lies in this shared nostalgia and the bonds we have formed over the years. It is these bonds that I aim to nurture and strengthen during my tenure.

As we move forward, our vision for DUAFI continues to expand. With your unwavering support and guidance, I am confident that our dedicated team will be able to turn these dreams into reality. We are committed to listening to your ideas, incorporating them into our collective goals, valuing your contributions, and working tirelessly to achieve our shared objectives.

Your presence and active participation are the cornerstones of DUAFI's success. Together, we can create a vibrant and dynamic community that honors our past while looking forward to an exciting future. As President, I am committed to fulfilling our collective dreams that have been nurtured since the inception of DUAFI, while also bringing new visions to life. Stay with us as you always have. We will make a difference.

GO DUAFI!

Warm regards,

**Dr. Ishrat Sultana Mita**
President-elect (2025-2026)
Dhaka University Alumni Forum, Inc.

# DUAFI Activities in 2023 – 2024

**Iraj Talukder**

The current Board of Directors took the helm of Dhaka University Alumni Forum Inc. for the term 2023 – 2024 on January 01, 2023. During these two years, our focus was You, the members of this esteemed association. We always cherish the vibrant group of people that you are, your enthusiastic and cheerful presence in all of DUAFI activities, your active participation in these events, and your generous support in all of our endeavors.

We believe that you, the members, are the life force of our organization and we strive to achieve your praise and satisfaction through our actions. Our goal was to provide a platform where the members can get together to enjoy, have fun and be merry being surrounded by friends and family and to leave behind the everyday worries and sorrows for a time being. Whether we could achieve our goals and fulfill your desires, will be reflected by your support and commendation of the activities of this Board.

Some of the activities taken and executed by this Board during these two years were –

- Organized Inauguration of the Board of Directors on Jan 21, 2023.
- Celebratrated 'Amar Ekushey and International Mother Language Day' on Feb 18, 2023, which was hosted by DUAFI and participated by 23 organizations in the DC Metro area.
- Held a program in memory of Dr. Nurul Islam, renowned economist, on Jun 8, 2023.
- Arranged a seminar by DUAFI scholars for the community in the 'DC Boimela 2023' on Aug 27, 2023.
- Arranged DUAFI Picnic 2023 on Sep 02, 2023.
- Cooperated in holding a book launching ceremony of Anis Ahmed's book "কতকথা কথকতা" on Sep 17, 2023.
- Participated in a Volleyball tournament organized by BAAI on Oct 8, 2023.
- Organized an online workshop on Web Development on Oct 22, 2023.
- Organized the "Cultural Show 2023" on Nov 11, 2023.

- Cooperated in holding a book launching ceremony of Ashraf Ahmed's books "রোমান সাম্রাজ্যের বর্তমান ও অতীত" and "বেগম রোকেয়া" on April 28, 2024.
- Cooperated in holding a book launching ceremony of Ahsan Zaman's book "রোদ্দুরে শোকের ছায়া" on Jul7, 2024.
- Organized the Annual Picnic on Sep 8, 2024.
- Organized the gala event of this Board the Reunion 2024 on Dec 7, 2024.

Although some of our plans did not see the light of the day due to unforeseeable situations, we put in our best effort to entertain you through out our tenure and rise on the occasion whenever needed. We strive to give you our very best in running this esteemed organization and presented you the above activities so that we can all get together to have some fun, 'adda', enjoy music and good food, meet friends and family, and forget the turmoil of daily life.

As we bid farewell to you and transition to the newly elected Board of Directors, we thank you from the bottom of our heart for being with us in every step of the way. We wish you the best of health, fortune and prosperity. May your life always be full of laughter, happiness, and peaceful.

We wish that your support, generosity, and guidance will continue for the new Board of Directors.

Thank you.

**Iraj Talukder**
General Secretary
DUAFI

# Board of Directors

## BOD 2023 - 2024

Dr. Abdul Quayum Khan
President

Dr. Ishrat Sultana Mita
Vice President

Iraj Talukder
General Secretary

Dr. Nazmul Haque Ronnie
Joint Secretary
(Jan 2023 - June 2023)

Dorothy Bose
Joint Secretary
(July 2023 - Dec 2024)

Ahsan Kabir
Treasurer

# Board of Directors 2025 - 2026

# DUAFI Election 2023-2024

## Members of the Election Commission

**Mr. Wahed Hossaini**
Chief Election Commissioner

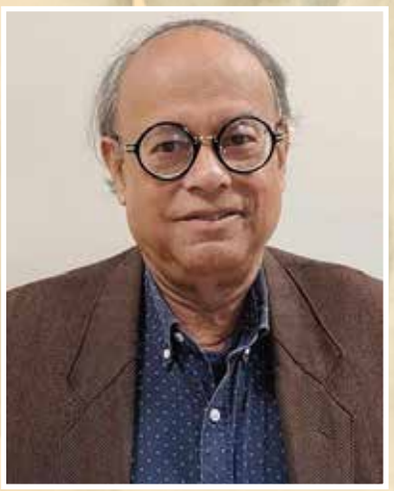

**Mr. Anis Ahmed**
Election Commissioner

**Dr. Dilara Islam**
Election Commissioner

# Birth of Dhaka University Alumni Forum Inc. (DUAFI)

In the late nineties, Dhaka University Graduates started coming to the greater Washington DC area (MD, VA, DC) in relatively good numbers. In 1998, a few Dhaka University (DU) graduates living around the Washington DC region, with endless memories, love, and passion for Dhaka University came together and formed an organized platform solely for DU graduates.

On April 25, 1998, the first reunion was held. The enthusiasm brought by the first reunion was enormous. Within two months of the first reunion, the graduates decided to hold a second reunion. Alumni of campus graduates continue to hold reunions in 1999, 2000, 2003, 2006, 2008, 2009, and 2010 before forming Dhaka University Alumni Forum Inc (DUAFI) in 2012. There were souvenirs published at each reunion with different slogans/names, were rich in articles, poetry, reminiscences etc. In addition to these reunions, the graduates also organized picnics almost every year, arranged BoshontoUtshob, Boishakhi program, Ekushey program, published printed directory of graduates living in the Washington DC area, and put together cultural program 'Nirmal Shongit-Shondhya' for the community. They also introduced scholarship for students studying at Dhaka University.

While there were many graduates who tirelessly worked for these reunions and some other activities, there was formal leadership by the following graduates as conveners, presidents, or interim conveners. Interim conveners were responsible for holding the election/selection process for the conveners and sometimes organized activities other than reunions.

Conveners/Presidents must have organized one or more reunions and some other activities.

**Conveners/Presidents:**

Late Dr. Mohammed Shahhbuddin (Biochemistry)
Late Dr. Mohammed Shahhbuddin (Biochemistry)
Dr. Bashir Ahmed (Statistics)
Dr. Afzal Chowdhury (Microbiology)
Dr. Arifur Rahman (Biochemistry)
Mrs. HosneJafrul (Soil Science)
Dr. Shoaib Chowdhury (Biochemistry)
Mr. Moeen Chowdhury (Public Administration)
Late Mr. Shah Jahangir Biswas (Library Science)
Mr. Shah Habibur Rahman (Commerce)

**Interim Conveners:**

Mr. MozharulHoq (Physics)
Mrs. Bulbul Islam (History)
Dr. Rashidul Alam (Biochemistry)
Mr. Anis Ahmed (Law)
Mr. Raihan Ahmed (Social Welfare)

Upon the unwanted division of Dhaka University graduates into two groups – DUGA and DUG, there had been continuous calls for unification from graduates across the board. To meet the unprecedented demand, the Late Mr. Shah J. Biswas and Mr. Shah Habibur Rahman, the then president and convener of DUGA and DUG respectively, jointly signed a unification process in early 2012 that led to the formation of two transition teams headed by Dr. Afzal Chowdhury and Dr. Shoaib Chowdhury. The two teams, having unconditional support and encouragement from the Dhaka University graduates, spent numerous stressful hours together devising policies and procedures and crafting an 'Article of Incorporation' (AOI) for the creation of Dhaka University Alumni Forum Inc. (DUAFI) with renewed interest and enthusiasm. The first DUAFI Board of Directors assumed the office of DUAFI on June 9, 2012. All subsequent DUAFI Boards benefitted from continuous support and encouragement from the Dhaka University graduates to strengthen the platform to cherish our endless love, passion, and memories for Dhaka University. All DUAFI members are deeply indebted to the Late Mr. Shah J. Biswas, Mr. Shah Habibur Rahman, the transition team members, the constitution committee members, and the election commissioners (listed below).

**Transition Team:**

Dr. Afzal Chowdhury (Team Leader)
Mr. Anis Ahmed
Dr. Atriqur Rahman
Mrs. Sharmin Choudhury
Dr. Mizanur Rahman
Mrs. Shahnaz Faruque

Dr. Shoaib Chowdhury (Team Leader)
Mr. Raihan Ahmed
Mr. Fazleh Chowdhury
Mr. Shafi Delwar
Mr. Mostafa Hossain
Mr. Kamal Mostafa

**The constitution committee:**

Mr. Anis Ahmed
Mr. Fazleh Chowdhury
Dr. Shoaib Chowdhury
Dr. Mizanur Rahman

**Election Commissioners:**

Mr. Anis Ahmed
Late Mrs. Jahanara Ali
Mr. Kamal Mostofa
Dr. Arifur Rahman

# Partitioning of India Was A Disastrous Event

**Mozharul Hoque**

Partitioning of India was a disastrous event for the people. But getting the British out of the country was in everybody's mind. My school days started in 1939, in third grade, when the World War II started on September 1st. These years, ending in 1947 with the countries division into India and Pakistan, were full of historically significant events.

There is still, in my opinion, no factual Indian History book written. The Oxford University Press book on Indian history reflects a British perspective. The Indian version (by Aswini Bhattacharya?) presents a Hindu (Indian Congress) viewpoint. Since Muslims had a lower literacy rate at the time, I don't believe there's a well-known Muslim perspective, especially not in Bengali.

After the partition, the Dhaka University was the only university in East Pakistan. It was originally built before the partition of India as a residential university in the style of Oxford University, with scholarly, well-known teachers. Students had to reside on campus. After the partitioning of India, it had to perform like the huge Calcutta University – a central university managing all the colleges and educational institutes in pre-partition Bengal. Most non-Muslim teachers, who were the majority of the teachers, left for India, leaving Dhaka University almost without any experienced teaching staff. Yet, for the love of Bengal, a few well-known teachers stayed with the university.

As a repercussion of a communal riot in Calcutta, a reciprocal riot broke out in Dhaka in February, 1950. The university was shut down. Many non-Muslim teachers left Dhaka University, making the university almost inoperable. Many of my Physics Department teachers left, making the department almost inoperable. We had Sukriti Samaddar, the only Hindu student in the Chemistry Department. Naturally, I enquired about her safety. She said she was safe, but she also left after a while.

There were incomprehensible atrocities in Wari and many other non-Muslim areas, like Gandaria, etc., in Dhaka. The authorities moved people from those affected and would-be affected areas to Dhaka College, making it into a concentrated camp for safety. For a lack of trained people, available medical college students were mobilized

to help manage the victims by vaccinating hundreds of people who were hurdles into the small classrooms for protection against any endemic diseases like Cholera, Smallpox, etc.

My friend from the medical college called me at the S.M. Hall to volunteer for the medical services needed at the concentration camps in Dhaka College. It was a gruesome sight at the camps. I saw severely injured old people, women, and crying children. I remember when I entered a hall packed with injured humans - men, women, and children, a tiny girl burst into a scream, reminding her perhaps what she had seen before that I had come back to attack them again.

One night, when I was in my room (Room 20, East House), a group of senior students, one of them an Arabic student in his MA class, came in and asked me if I knew how the Muslims in Calcutta were being treated and butchered and why I was here in Dhaka helping them. In reply, all I said was that it was my country where our people were mistreated, and I was helping our people. It was not my responsibility for what was happening in a foreign country.

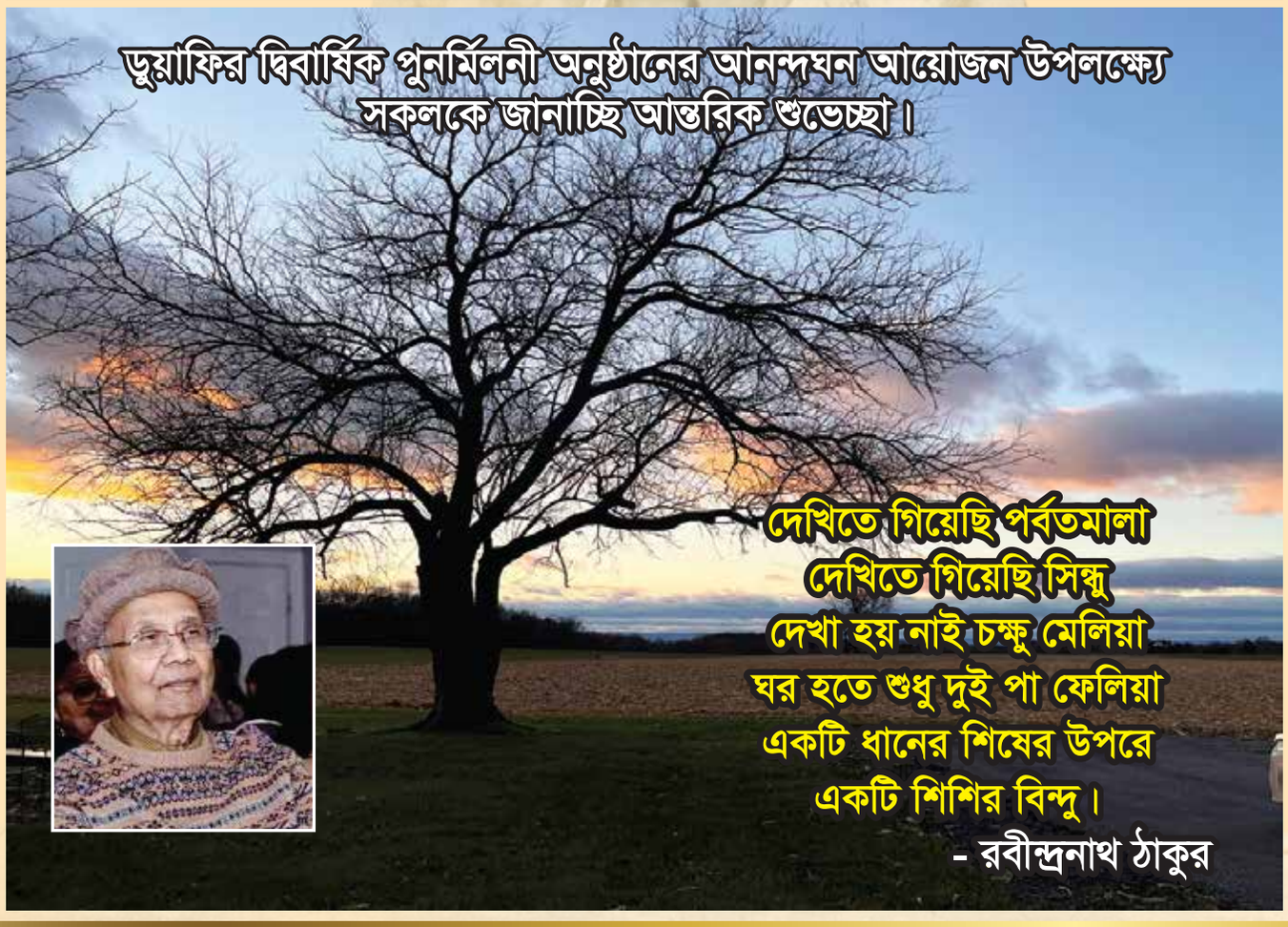

# স্বকথনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্য চর্চা ১৯৫১-১৯৬১

ড. আবদুন নূর

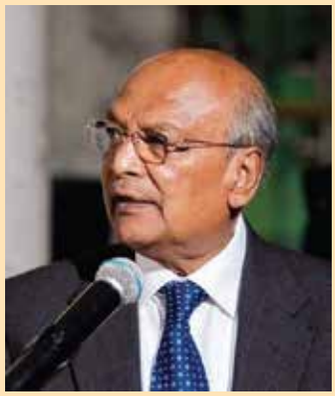

ইংরেজীর অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী স্বীকৃতি পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে ষাট দশকের অনন্য প্রাবন্ধিক ও চিন্তা নায়ক হিসাবে। অধ্যাপনা জীবনের ৬০ বছর ধরে তাঁর অনন্য ক্ষুরধার চিন্তা দীপ্ত রেখেছেন এবং লেখনী সজাগ ও অবিরল চলনশীল। উনিশশো পঞ্চাশ সাল থেকে আজিমপুর কলোনীতে থাকতেন বাবা মায়ের সাথে। হয়তো আমার চার বছরের অগ্রজ। তাঁর ছোট ভাই আমীরুল ইসলামের সাথে আমার ভাব বেশী ছিলো। কিন্তু লেখালেখির সৌন্দর্যতায় তাঁর সাথে নির্মিত হয়েছে আন্তরিকতা।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সম্পাদনা দফতর তিনতলায়। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। লিফট আছে কিনা খোঁজ করি। এর মধ্যে একতালায় উঠে গেছে বাংলা একাডেমী অনুবাদের দায়িত্বে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মী মুজাফফর আহমদ। অভয় দিলো "উঠতে থাকুন ধীরে ধীরে। অপেক্ষা করছি।"

সিঁড়ির মুখেই তাঁর কক্ষ। দরজা খোলা ছিল। ঢোকার ডান দিকের ছোট টেবিলে সবল কাঠের চেয়ারে দৃঢ় বসে আছেন তিনি। প্রায় ২০ বছর পরে তাঁর সাথে দেখা। হৃদয়গ্রাহী খোলা হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানালেন উষ্ণ হৃদয়ে। পাশের চেয়ারে বসতে বললেন। কক্ষে কয়েকজন অপেক্ষা করছিলেন। সিরাজ ভাই পরিচয় করিয়ে দিতে না দিতে বামে ছোট টেবিলে বসে থাকা অফিস ব্যবস্থাপক এনে দিলেন বড়ো কাঁচের বয়ম খুলে চার পাঁচটি চৌকো নোনতা বিস্কিট। আমার পরম প্রিয়। লালবাগের বেকারীগুলোয় ষাটের দশকে বানাতো। আধুনিক গুলশানের বেকারীগুলোয় এসব ট্রাডিশান বিস্কুটের কদর নেই। সাথে লেবু চা। "প্রথম এসেছেন। একটু নাস্তা করুন।" দরাজ গলা চেনা মনে হলো।

"আপনার সাথে আগে আমার ফোনে কথা হয়েছে।"সাথে সাথে চিনতে পারলাম। তিনি সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকার ব্যবস্থাপক। সাম্প্রতিক দু'টো ইস্যু হাতে নিয়ে এগিয়ে নিয়ে রাখলেন অধ্যাপকের টেবিলে। অপেক্ষারত অতিথির সাথে কথা বলতে বলতেই সিরাজ ভাই ম্যাগাজিন দুটো আমাকে ধরিয়ে দিলেন। "তুমি চোখ বুলোও। ততক্ষণে আমি কয়েকটি কথা সেরে নিচ্ছি।"

কথা সহসাই শেষ হলো। ফিরে তাকালেন সহাস্যে।

"তুমিই একমাত্র তরুণ যে সময়ের প্রবাহে চলাফেরায় একদমও বদলায়নি। কুড়ি বছর পরে দেখা হলো।"

"কথাটা আপনার ওপর বেশী প্রযোজ্য।" আমি জানাই। সত্য অর্থে। খুশী করতে নয়। ১৯৬০ সালে আগে তাঁকে যেমন উজ্জল সদাহাস্য দেখেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গনে তেমনি আজও। এখনো পক্ককেশে তেমনি তরুণ প্রাণ পুরুষ।

"ঢাকায় এলে মাঝে মাঝে ফোন করছো। কথা বলতে ভালো লেগেছে। শেষ দেখায় তোমার লেখা বাংলার ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস নিয়ে এসেছিলে। বিচলিত সময়ের চরিত্র বিন্যাসে তুমি অংকন করেছো বেশ কিছু বাংলার প্রতিবাদী নারী। কি আশ্চর্য্য। বাংলার প্রতিটি ধর্মবিশ্বাস হতে আহরিতনারীকুল। মারিয়া, রশ্মী, নাংছেন, আমিনা। ইতিহাসের কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র।"

"আপনার কি মনে হয় ইতিহাস অপমৃয়মান?" প্রশ্ন করি।

"যখন অতীতে ফিরে যাই অনেক স্মৃতি মুছে যায় না। স্বশ্বত প্রবাহিত হয়। ভাবতেই পারি না এতোগুলো দীর্ঘ বছর পাড়ি দিয়ে এখানে পৌঁছেছি।" সিরাজ ভাই বলেন।

"তুমি বাংলা একাডেমী থেকে এলে? বাংলা একাডেমীকে এখনো ভালোবাসো। বাংলা একাডেমীতে তোমার ছাত্র জীবনে অবিরল যাওয়া আসা ছিলো। দাপটে নাটক প্রযোজনা করেছিলে ছাত্র জীবনেই।" স্মরণ করিয়ে দিলেন সিরাজ ভাই। "আবদুল হকের নাটক প্রযোজনা করেছিলে। নতুন নতুন শিল্পীদের মঞ্চে নিয়ে এসেছিলে। ঢাকার একাডেমীক মহলে সমাদৃত হয়েছিলো তোমার প্রযোজনা।" ম্যাগাজিন দুটো এগিয়ে দিলেন সিরাজ ভাই। "এখানে নাট্যকার আবদুল হকের ওপর আমার একটি লেখা আছে।"

নাট্যকার আবদুল হকের রচিত "ফেরদৌসী" নাটকটি প্রযোজনার দায়িত্ব ছাত্রজীবনে আমি পেয়েছিলাম বাংলা একাডেমীর কর্তৃপক্ষের কাছ হতে। কেন বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ আমাকে প্রযোজনার দায়িত্ব অর্পিত করলেন? তাঁদের অভাবনীয় এই সিদ্ধান্তের পিছনে কি কি কারণ সন্নিবেশিত ছিলো। কে আমাকে সেই দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন? প্রশ্নগুলো থর থর করে ভেসে উঠলো সিরাজ ভাইয়ের কক্ষে।

একই প্রশ্ন ধারা ভেসে উঠেছে বছর দুই আগে নিউইয়র্কের একটি রেস্তোরায় প্রাবন্ধিক আহমাদ মাজহারের সাথে আন্তরিক কথোপকথনে। কিছুই মনে নেই আমার। একদম ভুলে গেছি। স্মৃতি অপসৃত হয়েছে অযাচিত মসৃনতায়। আহমেদ মাজহারের সাথে কথা বলার পর বার বার চেষ্টা করেছি স্মৃতি মন্থনে। কিছুতেই স্মরণ করতে পারছি না কোন শুভকাংখী এই অভাবনীয় দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত করলেন। শূণ্য। শুধু শূন্য স্মরণ। কেন? কেন? অথচ "ফেরদৌসী" নাটকের প্রযোজনার সাথে জড়িত প্রতিটি ঘটনা প্রতিটি অধ্যায় অম্লান রয়েছে আমার স্মৃতির ভান্ডারে। আমার অনুরোধে প্রথমবারের মত মঞ্চে এসেছিলেন কয়েকজন স্বনামধন্য জনপ্রিয় গুণী শিল্পী। নেপথ্যে কুশলী ছিলেন হাসান ইমাম।

ঢাকা বেতারের জন্যে অবিরল নাটক রচনার সূত্রপাত কাকতালীয়ভাবে আমার জীবনে এলো ১৯৫৯ সালে। সেই সময়ে ছয় মাস ধরে প্রতি রবিবার সকালে ছোটদের খেলাঘর অনুষ্ঠানে পরিচালক প্রযোজক রনেন কুশারী প্রযোজনা করেছেন আমার লেখা নাটক "হুতোম প্যাঁচার দেশে"। সে কালে রেকর্ডিং ছিলনা। সে জন্যে স্বীয় লেখার প্রযোজনা দেখতে আমিও হাজির হতাম নাজীমুদ্দিন রোডের স্টুডিওতে। ভীষণ মজা পেতাম। পরবর্তী কালে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে শিশুদের নাটক "হুতোম প্যাঁচার দেশে।"

এক রবিবার, হুতুম প্যাঁচার প্রচারের পর ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে বেরুবার সময়ে দেখা হলো কালাম ভাইয়ের সাথে। শামসুদ্দীন আবুল কালাম। তিনি তার অফিস ঘর হতে বেরিয়ে আসছিলেন। আমাকে দেখে ডাকলেন। "ভেতরে আয়।" এলাম। "ছোটদের জন্যে লিখছিস। বড়োদের জন্যে কিছু লিখবি?" আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাই। "তুই পারবি কি জীবন্তিকা লিখতে?" জীবন্তিকা একটি বিশেষ ধর্মী ডকুমেন্টারী ঢাকা বেতারে সে সময়ে প্রচারিত হতো কণ্ঠের প্রয়োগে। কথোপকথনের ভংগীতে সমসাময়িক কোন ঘটনা নিয়ে গুণীজনের বক্তব্য। পনোরো থেকে কুড়ি মিনিটের অনুষ্ঠান। স্বনামধন্য বেশ কিছু প্রথিতযথা সাংবাদিক জীবন্তিকা লিখতেন। কিন্তু রচয়িতার নাম সাবধানবশত প্রচারিত হতো না। "তুমি আবু সিম্বেলর ওপর জীবন্তিকা লিখে আনো। আসছে সপ্তাহে ২৪শে সেপ্টেম্বরে প্রচারিত হবে জাতিসংঘ দিবসে।" আমি হতভম্ব। "নিশ্চয়ই তুমি আবু সিম্বেল সম্পর্কে জানো।" কালাম ভাই আমাকে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সুযোগ দিলেন না। "পরশু স্ক্রীপ্ট নিয়ে এসো।" কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। আমিও পিছু পিছু চিন্তিত মুখে।

আবু সিম্বেল সম্পর্কে সামান্য ধারণা ছিল। সেই ধারণাকে ক্ষুরধার করতে ছুটলাম তোপখানা রোডে অবস্থিত আমেরিকান লাইব্রেরীতে। দু'একটি বই পেলাম। ধার করলাম। পরদিন ভোরে গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্তরে ফুলার রোডে অবস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিলে। অবশেষে স্ক্রিপ্ট জমা দেই কালাম ভাইয়ের হাতে। প্রথম প্রচেষ্টা। নার্ভাসনেস ছিলো। আংগিকে কিছুটা বদলিয়েছি বক্তব্য, সংলাপের সংমিশ্রনে, ছোট গল্পের ধাঁচে। প্রচারের পর আদৃত হয়েছিলো। সেই থেকে শুরু হলো আমার ছাত্রজীবনের নিয়মিত জীবন্তিকা লেখা। প্রধান শুভকাংখী ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও শরফুল আলম। প্রচুর লিখেছি ওদের নির্দেশে। সেইকালে সম্মানী পেতাম প্রতিটি লেখার জন্যে দশ থেকে পনেরো টাকা।

প্রথম মঞ্চ নাটক আমি লিখেছি শরফুল আলমের কড়া নির্দেশে এবং তাঁর অর্পিত অভিনয়ের কাঠামোয়। যতদূর মনে পড়ে ঢাকা বেতার কেন্দ্র তখন নাজিমুদ্দিন রোড থেকে সরে গিয়ে শাহবাগে স্থান নিয়েছে। ওখানে দফতর প্রশস্ত। এবং সাজানো। নতুন জীবন্তিকার স্ক্রীপ্ট জমা দিতে গিয়েছি তাঁর কক্ষে। সহাস্যে তিনি জানালেন "তোমাকে এখন আমি নতুন একটি দায়িত্ব দেবো। ঢাকা বেতার থেকে নয়। আমি জানি তুমি পারবে। তোমাকে ফরমায়েশী মঞ্চ নাটক লিখতে হবে।"

প্রযোজক শরফুল আলম জানালেন পূর্ব পাকিস্তানে যক্ষা সমিতির বার্ষিক সমাবেশ ঘটবে মাস খানেক পরে। সমিতির সভাপতি ডক্টর নূরুল ইসলাম। বিশিষ্ট চিকিৎসক। সমাজ সেবায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। সর্বজন আদৃত ও শ্রদ্ধেয়। তিনি শরফুল ভাইকে অনুরোধ করেছেন যক্ষা সমিতির বার্ষিক সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানের জন্যে একটি নাটক মঞ্চস্থ করতে। সেই নাটকের মূল বক্তব্য হবে যক্ষা রোগের নিরোধনে সুশীল সমাজের সার্বিক ভূমিকা।

"ওই ফরমায়েশী মঞ্চ নাটক তোমাকে লিখতে হবে। থিম জেনেছিস। কিন্তু নাটক যেন কিছুতেই জীবন্তিকার মতো বক্তব্যমূলক না হয়। নাটক হতে হবে নাটকের মতো। কিন্তু বক্তব্য থাকবে যক্ষা প্রতিরোধের। দেড় থেকে দু'ঘন্টার নাটক। চার বা পাঁচ অংকের।" কড়া নির্দেশ পেলাম। আমি স্তম্ভিত। হার্ট তড়তড় করে ছুটছে। এতো বড়ো দায়িত্ব। মঞ্চ নাট্য জগতে তখন বিরাজ করছেন নূরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ, মুনীর চৌধুরী ও আবদুল হক এবং পশ্চিম বাংলার কিছু লেখক। আমার লেখার হাতে খড়ি শুধু জিবন্তীকা লিখে।

"সময় ভীষণ কম। দশদিনের মাঝে স্ক্রীপ্ট জমা দিবি"। আমি সময়ক্ষেপন না করে উঠতে চাই। অনুরোধটি কেমন করে হৃদয়স্থ করবো বুঝতে পারছিলাম না। শরফুল ভাইয়ের কঠোর স্নেহময় দৃষ্টি থেকে সরে আসা ভালো।

"আমার ফর্দটা দ্যাখ।" হাতে লেখা ফুলস্কেপ কাগজের একটি পাতা তিনি এগিয়ে দিলেন। দেখি তাঁর লেখা কাগজে গোটা বিশেক নামের ফর্দটি লেখা। ষাট দশকের প্রায় সব নামকরা জাঁদরেল নাট্যশিল্পীদের নাম সেই ফর্দে লেখা। ছেলেদের মাঝে রয়েছেন মুহম্মদ কাফী খান, দাউদ খান মজলিশ, মুজিবুর রহমান খান, আমিনুল হক, গোলাম মুস্তফা ও ইকবাল আনসারী খান। মহিলা শিল্পীদের ফর্দে রয়েছেন সুমিতা দেবী, রাণী সরকার, গীতা দত্ত, কামেলা খান মজলিস, জহরত আরা। নতুন শিল্পী ঝর্ণা বশাক।

"এরা সবাই থাকবে আমাদের নাটকে। যক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করছি। সব শিল্পীদের এক সাথে মঞ্চে নামাবো। তোমার নাটকে সবার জন্যে চরিত্র থাকতে হবে। তুমি তো ওদের সবাইকে চেনো। ওদের সাথে নাটকেও কাজ করেছো।

"আমি চিনি। আমি ওদের অভিনয় দেখেছি। ওদের সাথে অনেক কথা বলেছি।" আমি সাগ্রহে জানাই। "সেই জন্যেই তোমাকে নাটক লেখার ভার দিলাম। তোমার নাটকের প্রতিটি চরিত্র সৃষ্টি করবি ওদের চরিত্রের সাথে মিলিয়ে।"

"আমার প্রথম নাটক হবে ফরমায়েশী সাজানো নাটক শরফুল ভাই।" ঠাট্টার ছলে প্রশ্ন করি শরফুল ভাইকে। বেয়াদবী আবার না হয়ে যায়।

"একেবারে ফরমায়েশী। যক্ষা সমিতি আমাকে ফরমায়েশ দিয়েছে। আমি তোমার ফর্মুলা দিচ্ছি।"

জীবনের প্রথম মঞ্চ নাটক লেখার দায়িত্ব পেলাম। চরিত্র পেলাম। সময় পেলাম মাত্র দশদিন। মন ভেবে ভেবে অস্থির। অভ্যাসরত কাগজ কলম নিয়ে রাত এগারোটা-বারোটায় বিছানায় উপুর হয়ে শুয়ে বুক বালিশে ভর দিয়ে লিখতে পছন্দ করতাম। কলম সাদা কাগজে চালু হলে মস্তিস্কে নিহিত ভাবনা চিন্তা নিয়ে কলম তর তর করে এগিয়ে যেতো। ঘরে নির্বিঘ্নে সবাই ঘুমুচ্ছে। কোন শব্দ নেই। নিরবতা বিরাজ করছে। কেউ বিরক্ত করছেনা। লেখা এগিয়ে চলছে। তবুও লিখতে লিখতে অনুভব করতাম মা এসেছেন খালি পায়ে ধীরে ধীরে। পাছে আমার লেখার নিমগ্নতা ভঙ্গ হয়। পাশের টেবিলে রেখে যেতেন ছোট বেকারীতে সন্দেশ। ঘরে বেক করা কেক। বা বিস্কুট। তিনি জানতেন লিখতে লিখতে কিছু খেতে আমি পছন্দ করি। কখনো বা মনাক্কা। লম্বা শুকনো কিসমিস। চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে আমার ভীষণ ভালো লাগতো।

বার বার চেষ্ট করছি। ফরমায়েশী ফর্দ মাফিক নাটকের লেখা কিছুতেই কাগজে দাগ বসায় না। লেখা এগোয় না। প্লট নিয়ে আঁকা বাঁকা খেলছি। নোট করছি। ছিড়ছি। মনে আনছি। নোট জড় করছি। আবার কেটে ফেলছি। যেসব প্লট মনে আসছে সবই মনে হচ্ছে যেন মেকী। আসলে পারছিনা খাদহীন আসল জীবন্ত চরিত্র। চেনা চরিত্র। বানানো নয়। কৌশলী সৃষ্টি করা নয়। দুটো জিবন্তিকা লেখার দায়িত্ব ছিলো। সেগুলো লেখা শেষ করলাম পর পর দুই রাতে। কিন্তু শরফুল ভাই অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমি অক্ষম। না হচ্ছে মঞ্চ নাটকের প্লট। না হচ্ছে চরিত্র সৃষ্টি।

মাঝে একদিন বেতারে গেলাম অন্য কাজে। শরফুল ভাইয়ের সাথে দেখা করতে চাইনি। অথচ ঠিক তারই মুখোমুখি হলাম।

"শুরু করছিস।" মিথ্যা বলতে চেয়েও বলতে সাহস হলো না।

"লেখা এগুচ্ছে না।" ধরি মাছ না ছুই পানির ঢংয়ের অনুত্তাপ উত্তর।

"সংলাপ দিয়ে শুরু কর। ডায়ালগ লিখতে থাক। লেখার গতি পেয়ে যাবে। আগামী রবিবার বিকেলে বসবো আমরা। সব শিল্পীকে আসতে বলেছি। খবর পাঠিয়েছি। দেখি কারা কারা রিহার্সালে আসে। তোমার হাতে তিনদিন সময়।"

সে যুগে মুঠোফোন ছিলনা। টেলিফোন নেই সবার ঘরে ঘরে। তবু কেমন করে যেন শরফুল ভাইয়ের বার্তা পৌঁছে গেল শিল্পীদের কাছে। রিহার্সাল রুমে কমপক্ষে গোটা পঁচিশেক শিল্পী বসেছিলেন। মেয়েরা ছেলেরা। আমার দেরী হলো। ভাগ্যে ভালো শরফুল আলম এখনো এসে পড়েন নি। ভীষণ টাইম মেনে চলেন তিনি। ঘড়ি কাটায় পাঁচটায় এলেন তিনি।

"এনেছিস স্ক্রীপ্ট।"

ইতস্ততায় গোটা চল্লিশ পাতার ম্যানুস্ক্রীপ্ট বের করি। হাতে লেখা। তাঁর হাতে দেই।

"শুধু প্রথম দুই অংক এখানে।" "তৃতীয় অংকে নাটক শেষ করবি তাহলে?" হাসেন শরফুল ভাই।

"দাউদ। তুমিই শুরু করো সংলাপ পড়তে।" স্ক্রীপ্টটি এগিয়ে দিলেন দাউদ খান মজলিশকে। কামেলা খান মজলিস তার পাশে বসে। মৃদু হেসেছিলেনও।

নাটকটির নাম দিয়েছি "সূর্য তমশা।" লিষ্টিবদ্ধ প্রায় প্রতিটি শিল্পীর সমন্বয়ে। আদৃত হয়েছিলো। করতালি পড়েছিলো। শরফুল আলম কার্জন হলে মঞ্চে লেখকের পরিচয় প্রদান কালে বলেছেন তাঁর জানামতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত কোন ছাত্রের নাটক কার্জন হলে প্রথম মঞ্চস্থ হলো। গর্ববোধ করেছি। পরবর্তী সময়ে "সূর্য্য তমশা" নাটকটি মুদ্রিত হয়েছে আসাদুজ্জামান বাচ্চু সম্পাদিত "রঙ্গম" পত্রিকায়। ম্যাগাজিন কপিটি আমার হারিয়ে গেছে। কোন সহৃদয় পাঠকের কাছে অতীতে সংখ্যা থাকলে আমাকে পাঠালে বাধিত হবো।

বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন সময়ে আব্বা কুমিল্লায় বদলী হলেন। ছোটখাট সুন্দর নিঁখুত শহর! পরিস্কার ও পবিত্র। মানুষজন পরিচ্ছন্ন ও শুভ্র। মুখে হাসি। আদব কায়দা সম্ভ্রমে আচ্ছাদিত। যখনই গিয়েছি স্বল্প সময়ে জন্যে, সাতদিন, বা আটদিন, ভেবেছি সত্যি কি কুমিল্লার মানুষ বাংগালী? ওদের আমন্ত্রণী মনোভাবের জন্যেই বোধ হয় গুণী সমাজসেবী ও গ্রাম উন্নয়নকারী আখতার হামিদ খান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর স্বপ্ন জড়িত পল্লী আকাদেমী। চাকুরী জীবনে তাঁর সাথে পরিচিত হয়েছিলাম ও তাঁর সাথে কাজ করতে পেরেছিলাম।

আকাদেমীর নিষ্ঠ উন্নয়নে বাংলার দুই মহাপুরুষ নিবেদিত ছিলেন। প্রথম জন সর্বজন আদৃত কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। বহুগুণে অধিষ্ঠিত বরেণ্য কবি একাধারে ছিলেন নিষ্ঠ প্রশাসনিক, ধন্য ও স্বীকৃত কুটনীতিক এবং সর্বজনের আন্তরিক বন্ধু। অন্যজন ডক্টর আবদুল মুয়ীদ। তিনি পরবর্তীকালে ইউনেস্কো যোগদান করেছিলেন। প্যারিসে তাঁর বাড়ীর আতিথ্য ফরাসী বিপ্লবের সময়ে আমাদের পরিবারের এক অসাধারণ মনোরম অভিজ্ঞতা। ওর কন্যা তখন খুব ছোট। নাম মনে হয় অপর্ণা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটিতে আমার কুমিল্লায় থাকার সময় কার্য উপলক্ষে এসেছিলেন কাফী খান ও সহযোগী ওয়াহেদ হোসেনী। ওঁরা মার্কিন দূতাবাসের জনসংযোগ কর্মী ছিলেন। ওদের আকাদেমীর কাজ ছিলো। ওদের সাথে এক সন্ধ্যায় আদৃত ভোজনশালায় কলাপাতায় পরিবেশিত কই মাছ, ইলিশ মাছ, গরম ভাত ও ডালসহ রাতের খাবার খেয়েছি। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ আমাদের সাথে ছিলেন। ধুতি পরিহিত মালিক আমাদের অতি আদরে আপ্যায়ন করেছিলেন। কুমিল্লার রান্নার স্বাদ আলাদা। রসনা এখনো নড়ে। কাফী খানের নির্দেশে আমি ভয়েস অব আমেরিকা প্রতিষ্ঠানের জন্যে বহু স্ক্রীপ্ট লিখেছি। ঢাকা হতে রেকর্ড হতো। প্রচারিত হত।

কুমিল্লায় প্রতিটি ছুটির সন্ধ্যায় গভীর রাত পর্যন্ত যাত্রা অবলোকন করেছি অপ্রত্যাশিত মোহমোয়তায়। কি অলৌকিক ওদের অভিনয় ক্ষমতা। কুমিল্লায় মফস্বল শহরে অভিনয় করছেন খোলা আকাশের নীচে উন্মুক্ত ময়দানে নারী পুরুষ শিল্পী গলা ছেড়ে। কোন মঞ্চের উৎস নেই। কোন পট পরিবর্তন নেই। প্রতিটি শুরু হয়েছে পুরোন রীতিতে পুঁথি পাঠ নিয়ে।

আগ্রহ হলো পুঁথির প্রতি। কুমিল্লার বইয়ের বাজার হতে বেশ কিছু পুঁথি কিনে নিলাম। পুঁথি বিক্রী হয় বেশীর ভাগ ফুটপাতে। সাজানো বইয়ের দোকানে নয়। ঢাকায় ফিরে এসে কিছু পুঁথি সংগ্রহ করলাম পুরোন ঢাকার বই পাড়ায়। ওখানেও পুঁথি ফুটপাথে অবহেলিত।

পুঁথি পড়ার আগ্রহ বাড়তে থাকলো। মনে হলো পুঁথিকে কি ফিরিয়ে আনা যায়না আধুনিক জীবনে। মনে হলো অতীতে লিখিত পুঁথির কাহিনী অবলম্বনে লিখতে পারি নতুন কোন নাটক। মঞ্চের জন্যে নয়। বরং বেতারের জন্যে। লিখলাম পরীক্ষামূলক দেড়ঘণ্টার বেতার নাটক "আমীর সওদাগর"। পরম ইতস্ততায় নিয়ে এলাম শরফুল আলমের কাছে। চাইলাম তাঁর নিষ্ঠ মতামত।

ভীতু মনে অপেক্ষা করলাম দুই সপ্তাহ। শরফুল ভাইয়ের অফিসের দোর মুখ হতে ফিরে আসি। উঁকি দিই না। হয়তো ভীষণ বকা খাবো। অযথা বকা দিতে তিনি ওস্তাদ ছিলেন। স্নেহের বকা। তিন সপ্তাহ পরে নতুন জীবন্তিকার স্ক্রীপ্ট শামসুদ্দীন আবুল কালামকে জমা দিয়ে বেড়িয়ে আসছি। পিছন থেকে ডাকলেন শরফুল ভাই। "পরদায় উঁকি না দিয়ে চলে যাচ্ছিস কেন?" আমি আমতা আমতা করি। "তোর নার্ভাসনেস লাগছে। তোর স্ক্রীপ্টের ধরণ আলাদা। বেতারের নয় মঞ্চের নয়। শুধু যাত্রার। আমি স্ক্রীপ্টটা আমীরুজ্জামানকে দিয়েছি। বলেছি উনি পড়ে দেখুক।" বুক ঢড়াস করে উঠলো। "তিনি দেখুন আঙ্গিকটি কিভাবে আমরা বেতারে আনতে পারি।" বলতে বলতে শরফুল ভাই বেতারের কনফারেন্স রুমে চলে গেলেন। সভাকক্ষে মিটিং রয়েছে। তার মানে শরফুল ভাই বেতারে প্রচারে আগ্রহী।

ঢাকা বেতারের তদানীন্তন প্রধান পরিচালক, আশরাফুজ্জামান খান প্রযোজনা করেছিলেন "আমীর সওদাগর।" যুগপৎ মঞ্চস্থ হয়েছিলো ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সষ্টিটিউটে এক হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে এবং সম্প্রচারিত হয়েছিল দেশময় সাভার বেতার ট্রান্সমিটার হতে। সংগীত পরিচালনায় সমর দাস। পুথি পড়ে উদ্বোধনী গান গেয়েছেন আবদুল লতিফ।

পরের বছর লোকনাট্য সম্মেলনে রমনা খোলামাঠে শরফুল আলম উপস্থাপন করলেন তাঁর আদিস্ট আমার লেখা "হাতেমতাই।" দর্শকদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর আজম খান। পরের বছর উপস্থাপিত হলো "বেহুলা সুন্দরী।"

উনিশশো বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে রক্ত ঝরার সাথে সাথে সেই রক্ত লাল রক্তের তপ্ততায় হয়তো ঢাকায় বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মননে মঞ্চে অপেশাদারী নাটক উপস্থাপনের প্রয়াস দ্রুততর হলো। উনিশশো পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত ঢাকার নাট্য আন্দোলন পেশাদারীতে স্তিমিত ছিল। গতানুগতিক ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটক মঞ্চস্থ হতো বারংবার প্রধানত কলকাতা হতে ধার করে।

নতুন প্রবাহ সৃষ্ট হলো ১৯৫২ সালের পরে। পাঁচজন নাট্যকারের অনবদ্য অবদান বাংলার নাট্য সাহিত্যকে শুধু বলিষ্ঠ করেনি, উজ্জ্বলও করেছে। আমি ছাত্র জীবনে তাঁদেরও স্নেহ ও সান্নিধ্য পেয়েছি। নাট্যকার নুরুল মোমেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত ছিলেন মুনীর চৌধুরী। আসকার ইবনে শাইখ, আবদুল হক। ওরা হয়েছেন বাংলার নাট্য সাহিত্যে অগ্রধারার পরিচায়ক। মর্মস্পর্শী নাটক একের পর এক লিখে ওরা কালের উর্ধ্বে জননন্দিত হতে পেরেছিলেন। নাট্যকার নুরুল মোমেন এলেন মঞ্চে তার কালজয়ী নাটক নেমেসিস্

নিয়ে হঠাৎ করে। কি অপূর্ব প্রযোজনার আঙ্গিক। কি উজ্জ্বল উদ্দীপনাময় কথোপকথন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মফস্বল শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে নুরুল মোমেন যে কথা বলতে চেয়েছিলেন ষাটের দশকে, একবিংশ শতাব্দীতে সেই কথা সেই ভাষ্য এখনো প্রযোজ্য।

জনগণের মন জয় করেছেন মুনীর চৌধুরী তাঁর 'কবর' নাটকে। শুনেছি কারাগারে বসে লিখেছিলেন। বাংলার মহিমাময় ইতিহাস বিধৃত করেছেন নাট্যকার আশকার ইবনে শাইখ। নাট্যকার আবদুল হক, "ফেরদোসী" নাটকে তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্য প্রথিত করেছেন আমাদের ঐতিহ্যে।

সেকালে নাটক মঞ্চস্থ হতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে এবং প্রধানত মাহবুব আলী ইন্সটিটিউটে। নওয়াবপুর রোড ক্রসিংয়ের সাথে ঢাকার ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের উল্টোদিকে। সংস্কৃতিমনা ঢাকাবাসীর ঘরবাড়ী সেই সময়ে ছিলো কয়েতটুলী, আগাহ মাসিহ লেন বা জিন্দাবাজার বা আরমানীটোলায়। অল্প দূরে ওয়ারী, গেন্ডারিয়া, নারিন্দা। কিছু দূরেই একদিকে সদরঘাট অন্য দিকে বকসীবাজার। রাতে নাটক শেষ হলে অনায়াসে হেটে হেটে ঘরে ফেরা যেতো। রিকশা প্রতুল ছিল। ঘোড়ার গাড়ী অপ্রতুল।

নুরুল মোমেন দর্শকদের বাহবা কুড়োতে ভালোবাসতেন। তাঁর দর্শক দুর্বলতা ছিলো। দর্শক সেই দুর্বলতার কথা জানতো। নাটক শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তিনি মঞ্চে প্রবেশ করতেন। জোরে জোরে বারংবার করতালি হতো। করতালি তাঁর যথাযথ প্রাপ্য। অথচ তিনি মঞ্চে দাড়িয়ে দর্শক করতালির সময়ক্ষণ নিরিখ করতেন। হেসে বলতেন আজ মাত্র ষাট সেকেন্ড করতালি দিলে। গেল বার একই নাটকে পেয়েছি একশো বিশ সেকেন্ড। আগামীকাল শেষ প্রদর্শন। নিশ্চয়ই দুশো চল্লিশ সেকেন্ড হবে। নুরুল মোমেনের বক্তব্যে রসিকতা ছিল।

অন্যদিকে মুনীর চৌধুরীর মঞ্চে উপস্থিতি হতো গুরুগম্ভীর। এমনিতে তিনি সদা হাস্যরত। তার ঠোটে সমসময় হাসি। যখন তিনি অধ্যাপনায় রত ক্লাসরুমে তখনো। যখন তিনি ঢাকা বেতার কেন্দ্রের খেলাঘর অনুষ্ঠানে আসতেন রনেন কুশারী প্রযোজিত ধারাবাহিক শিশু নাটক "হুতোম প্যাচার দেশে" অংশ গ্রহণে তখনো। আমি তাঁকে দেখেছি ভাষা আন্দোলনের নানা পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে বক্তৃতা দিতে। দেখেছি বিচারক হয়ে আসতে বিভিন্ন হল আয়োজিত আন্তহল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায়। হাসি যেন তাঁর নেশা। তাঁর রচিত ও প্রযোজিত নাটক শেষে তিনি মঞ্চে প্রবেশ করতেন আশ্চর্য রহস্যময়তায় নিজেকে ঘিরে রেখে। তিনি নাটক সৃষ্টি করেছেন। সে নাটক তিনি দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। তার প্রিয় শিল্পীরা প্রাণ দিয়ে তাঁর নাটককে রূপায়িত করেছে। সুন্দরতম কণ্ঠে ডায়ালগ প্রক্ষেপ করেছে। অনুভব করতে পারতাম তিনি অতি স্নেহে ও আবেগে প্রতিটি শিল্পীকে প্রতিটি মঞ্চ কর্মীকে তার শুভ্র মনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। কিন্তু মঞ্চে দেয়া তাঁর বক্তব্যে আমি কখনো উপলব্ধি করতে পারিনি সেই মঞ্চায়িত নাটকে হয়েছেন কি তিনি মুগ্ধ!

আসকার ইবনে শাইখ নিভৃত নাট্যচারী। নাটক মঞ্চায়নের পর ওঁকে আমি কদাচিৎ মঞ্চে আসতে দেখেছি। তিনি নাটকের হলে দুরের চেয়ারে বসেই তাঁর মঞ্চস্থ নাটক দেখতেন। নাট্যকার নাটকের হলে উপস্থিত সে কথা তিনি দর্শকদের জানাতে চাইতেন না। নাট্যকার আবদুল হক দর্শকদের ভাব অনুভাব পশ্চাতে থেকেই পর্যালোচনা করতেন। নাটক শেষ হওয়ার পরপরই অন্যান্য দর্শকদের সাথে সারি মিলিয়ে তিনিও হল থেকে বেরিয়ে যেতেন নিভৃতে।

দীর্ঘ ৫০ বছর পরে সম্ভবত ২০১০ সালে কলকাতায় মঞ্চস্থ হয়েছিল বাংলার কালজয়ী পূঁথি কাহিনী "বেহুলার ভাসন।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রযোজক অধ্যাপক জামিল আহমেদ দর্শকদের বার বার অনুরোধ সত্তেও কলকাতার মঞ্চে প্রবেশ করতে রাজী হননি। মঞ্চে দর্শকদের কাছে না আসার অনীহা কেন বাংলার প্রথিতযশা নাট্যকার ও প্রযোজকদের সাথে গ্রন্থিত হল। প্রশ্ন থেকে যায়?

পরিশেষে স্বীকার করতে চাই, নাট্যকার ও লেখক আমি হঠাৎ করে গজিয়ে উঠিনি। আমার লেখক জীবনের ক্রমপ্রয়াসে বহু গুণীজন বলিষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। জীবনের প্রান্তিক সময়ে এসে মনে হয় খেলাঘরের ভাইয়া হাবীবুর রহমান, কচি কাঁচার আসরের দাদা ভাই রোকনুজ্জামান খান, ঢাকা বেতারের শামসুদ্দীন আবুল কালাম এবং শরফুল আলমের প্রেরনা ও দিকনির্দেশনাক্রমেই আমি আজ অবধি কলম সচল রাখতে পেরেছি। আমি কৃতজ্ঞ তাঁদের প্রতি।

# Nazu Khan- An Icon of Salimullah Muslim Hall

**Ziauddin M. Choudhury**

A hallmark of Dhaka University when it was set up was its residential character. A student had either to be a resident in one of its student hostels called "Halls" or attached to it. You were identified by your residential hall. There were only six of these in the sixties, Salimullah Muslim Hall, Fazlul Huq Muslim Hall, Dhaka Hall, Jagannath Hall, Iqbal Hall—all for boys, and Rokeya Hall –the only residential hall for girls. There was friendly rivalry among the Halls, and of course to each resident his Hall was the finest.

We in Salimullah Muslim Hall (SM Hall) took inordinate pride in our hall, for its beautiful architecture reminiscent of the Mughal buildings, tennis lawns that adorned the front like green carpets, and tree-lined driveway to the porch. Other Halls had their share of good-looking buildings and lawns, but one special feature distinguished SM Hall from the others in a very unique way. This was Nazu Khan, the grand guardian of the SM Hall Portal. A tall, fair skinned, and heavily mustachioed man—Nazu Khan officially was the head guard of SM Hall, but unofficially he was an icon of SM Hall who exuded the presence of a royal guard harking back to Mughal days.

To all of us SM Hall residents as well as visitors to the Hall, Nazu was synonymous with SM Hall. Attired in khaki shilwar and kurta with a white turban topped by a starched end Nazu Khan was the very image of a palace guard who became part and parcel of SM Hall as an institution. In my three years as a resident in early sixties, I do not recall a single day when I did not see him in his resplendent outfit. He would greet every resident and visitor with a salute and offer to help when a new student arrived laden with luggage. He almost bolted from his post to open the door of a car when a visitor arrived, greet the visitor, and respond to any questions with great respect.

Two things that Nazu Khan pampered were his moustache and his turban. In fact, these were extensions of his personality that he would be recognized for, besides his politeness and steadfastness to his duties as a Guard. He took great care in preparing his turban—he had several of them. The turbans were white, crisp, and imposing. He took great time tying the turban around his head so that the top could stand on the head as a small fan. Nazu Khan's dexterity with the turban became so legendary that his services became de rigeur in big weddings. I recall many former students of SM Hall

who went on to high offices later beseeched Nazu Khan to tie their turbans, and Nazu Khan gladly obliged them. Probably his last turban preparing service was in early 1971 for the wedding of a friend—Masum Ahmed Chowdhury—who worked as Bangladesh Ambassador to several countries.

I do not know the full story of how Nazu Khan came about to be the job of the principal guard of SM Hall, nor where he originally belonged. He was generally known to be a Pathan, but we did not know if he came from the North West Frontier or Afghanistan. It is generally believed that his ancestors settled somewhere in India, and he came to Dhaka in early fifties. He spoke Urdu with a heavy accent, and over time he had also acquired proficiency in Bengali. But we mostly conversed with him in Urdu, whatever little we knew.

Nazu Khan lived in a small quarter within SM Hall premises. I do not recall if he had a family. People I know from that time also cannot vouch if Nazu was ever married. He was a quiet man devoted to SM Hall, the Provost and the residents there. His cheerful and towering presence at the gates was a reminder that everything was well. In those days when police presence in the Halls was an unimaginable event, Nazu and his assistants provided us with all the security we needed. There was no fight in the Halls, nor was there any remote chance that we would be invaded by any alien force. Our Hall was our fort, and with Nazu Khan at the gate we felt safe.

Another little-known hobby of Nazu Khan was making turbans (pugrees) for bridegrooms. Many of former students who knew of this talent of Nazu Khan had their wedding pugrees made by Nazu Khan. He made classic turbans from scratch. I had mine made by Nazu Khan.

It is a great tragedy for all of us that this icon of Salimullah Muslim Hall, a legend of our time, a part of the history of our great Hall, met with a cruel and unforgivable end. Nazu Khan was killed by an angry mob in the turbulent days of March 1971 when people were seeking revenge on the non-Bengali population for their support to Pakistan. (The attackers were not students of Dhaka University.) Like a true guard wedded to his post, Nazu had never left his position in SM Hall even though he was informed of likely attacks on him, if for no other reason than the fact of his being a non-Bengali. He probably thought he was loved and well liked far too much to have any enemies. He discounted the mad frenzy of the time, and the senseless acts of violence that were ruling the city. I am told Nazu Khan was kidnapped from SM Hall, and violently disposed off. His body was never found.

I wonder if there was any memory left of this great soul in SM Hall today; probably none. I wish if in his honor former SM Hall students could find a way to remember him, at least with a plaque dedicated to his memory.

*The writer was a resident of Salimullah Muslim Hall from 1961 to 1964.)*

# ওয়াশিংটনে প্রতিবছর ডুয়াফির পুনর্মিলনী হয়, হয় নানান অনুষ্ঠান

ইকবাল বাহার চৌধুরী

বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে ওয়াশিংটনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের যেকোনো অনুষ্ঠান বা পুনর্মিলনীতে যোগদান করার চেষ্টা করি। ভাল লাগে - আনন্দ পাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন কেমন ছিলো তা বলা, ব্যাখ্যা করা কঠিন। ছাত্রদের সঙ্গে নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রিকেট খেলা, বার্ষিক স্পোর্টস, হল আর ডাকসুর নির্বাচন সবই ছিলো সকলের আকর্ষণীয় তৎপরতার অংশ।

ব্যক্তিগতভাবে আমি হলের আর ডাকসুর বার্ষিক নাটকে অংশ নিয়ে আনন্দ পেয়েছি। মুনীর চৌধুরী, নূরুল মোমেন, আসকার ইবনে সাইখ, রফিকুল ইসলাম এই সব শিক্ষকদের সঙ্গে নাটকে অংশ নিয়েছি, যে স্মৃতি ভুলে যাবার নয়।

*তেহরান ১৯৬১ ঃ পাকিস্তান সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে ইরানের শাহ ও রানী ফারাহ্ সাথে।*

বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক ছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আবৃত্তির আসর ছিলো খুবই আকর্ষণীয়। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই ১৯৫৮ সালে। অর্থনীতি বিভাগে B.A. (Hons) ক্লাসে যোগদান করি। Dr. M. N. Huda ছিলেন আমাদের Head of the Department, Dr. Mazharul Haq, Dr. Nurul Islam, Dr. Rehman Sobhan, Dr. Anisur Rahman, Dr. K. T. Hossain এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষক ছিলেন। পড়াশুনার পরিবেশ ছিলো অন্যরকম। শিক্ষকদের আমরা ভীষণ সম্মান করতাম, শ্রদ্ধা করতাম। Dhaka University Economics Association ছিলো। সব ছাত্ররা ছিলো এর সদস্য। অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ছিলেন এই এসোসিয়েশনের President। এক পর্যায়ে আমি ছিলাম Association এর General Secretary। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিভাগের ছাত্রদের Cricket Team ছিলো। এক পর্যায়ে আমি Economics বিভাগের Cricket Team এর Captain হয়েছিলাম। নিয়মিত প্রতিযোগিতা হতো বিভিন্ন বিভাগের Team গুলোর মধ্যে। আমাদের ছেলেরা নিজ নিজ হলের

*Washington এ First Lady Hilary Clinton-এর সাথে*

*Washington এ উত্তম কুমার ও সুপ্রিয়া দেবীর সাথে*

সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশ নিতো। আমাদের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, sports ও অন্যান্য খেলাধূলা হতো নিয়মিতভাবে। DUCSU আর বিভিন্ন হলের নবনির্বাচিত হল ইউনিয়নের শপথ অনুষ্ঠান হতো নিয়মিতভাবে। আর হতো বার্ষিক নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

গণমাধ্যম আর সাংবাদিকতার কথা বলতে গেলে- ছেলেবেলার কথা, ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে। ১৯৫০, ১৯৫১ সালের দিকে আমি ঢাকা বেতারে আবৃত্তি, ছোটদের নাটক করা শুরু করি। সেই সময় Radio Station ছিলো নাজিমউদ্দিন রোডে একটি বাড়ীতে। পরে নিয়মিতভাবে বড়দের অনুষ্ঠান আর নাটকে অংশ নেই। ১৯৬০ সালে এখনকার Intercontinental Hotel এর পাশে নতুন ভবনে ঢাকা বেতার কেন্দ্র স্থানান্তর করা হয়। সেখানে বাংলা সংবাদ পাঠ শুরু করি। ১৯৬৪ সালের December এর শেষে ঢাকা DIT ভবনে শুরু হয় TV। তিন মাসের জন্য ঢাকায় পরীক্ষামূলকভাবে টেলিভিশন চালু হলো। তখন থেকেই আমি TV সংবাদ উপস্থাপন শুরু করি। ১৯৭৩ সালে VOA তে যোগদানের আগ পর্যন্ত আমিই ছিলাম সারা বাংলাদেশের মূখ্য TV সংবাদ উপস্থাপক। প্রায় চার দশক ওয়াশিংটনে VOA-তে কাজ করার পর বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে অবসর নেই ২০০৮ সালে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে এবং পরে দেশের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, প্রেসিডেন্ট আর প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার নিয়েছি ঢাকা, ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্কে জাতিসংঘে। সেই সব স্মৃতি ভোলবার নয়। তরুণ প্রজন্মের যারা এখন আমেরিকায় বা বিদেশে তারা যদি পেশা হিসেবে সাংবাদিকতাকে বেছে নিতে চায় সেক্ষেত্রে তাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে। দেশ বিদেশের ইতিহাস, চলতি ঘটনা, সমকালীন নানান বিষয় নিয়ে আগ্রহী হতে হবে।

*১৯৯০ সালে হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন মোহাম্মদ আলির সঙ্গে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে*

দেশ বিদেশের বিশিষ্ট নেতা-নেত্রীদের এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতার সাথে যুক্ত হবার চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া লেখালেখির দিকেও বেশ কিছুটা মনোনিবেশ করতে হবে।

*কলকাতায় কবি নজরুল ইসলাম পরিবার লেখক মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার পরিবার*

ডুয়াফির নানান তৎপরতা ছাড়া দেশ-বিদেশের খবরাখবর এবং সাংবাদিকতার বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে নিজেকে জড়িত রাখতে হবে। বাংলাদেশের এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক নানান খবরাখবর এবং তথ্য মাধ্যমের সঙ্গে নিজেকে জড়িত রাখতে হবে।

আজ জীবনের সমাপ্তি লগ্নে ওয়াশিংটনে DUAFI আর বাংলাদেশীদের নানান তৎপরতার সাথে যুক্ত থাকার চেষ্টা করি। অতি সম্প্রতি একটি নাটক দেখতে গেলাম।

*১৯৬৮ ঃ বাংলা একাডেমীর নাটক ভ্রান্তবিলাস। ইকবাল বাহার চৌধুরী বিলকিস নাসিরুদ্দিন, রামেন্দ্র মজুমদার, লিলি চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল মামুন ও অন্যান্যরা।*

একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়– ঢাকার ওয়াইজ ঘাটে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি অঙ্গনে BAFA-র অবদান অসামান্য। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার মা- আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, ফুপু শামসুন নাহার মাহমুদ ও বড় বোন সেলিনা বাহার জামান বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং অবদান রেখেছেন।

১৯৫৪ সালে ঢাকায় কার্জন হলে সাহিত্য সম্মেলন হয়। কলকাতা থেকে বেশ কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিক সেই সম্মেলনে যোগদান করেন। দুই বাংলার শীর্ষস্থানীয় কবি সাহিত্যিকরা এতে অংশ নেন। মনে পড়ে অনেকেই শান্তিনগরে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন আমার অসুস্থ বাবা- সাহিত্যিক হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরীকে দেখতে। দুই বাংলার এইসব লেখকদের মধ্যে ছিলেন- মনোজ বসু, রাধারানী দেবী, নরেন দেব। আর ছিলেন কবি জসিমউদ্দিন, সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান ও আরও অনেকে।

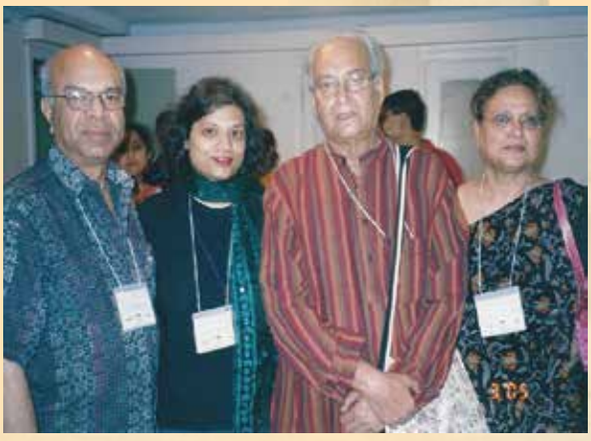

*২০০৫ : নিউইয়র্কে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে*

সেই সঙ্গে গান-বাজনা, নাচ আর আবৃত্তির একাধিক অনুষ্ঠান উপভোগের সুযোগও হয়েছিলো।

আর পুরোনো দিনের অনেক কথাই মনে পড়ছে। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশক আর ১৯৭১ এবং ১৯৭৩ সালে আমেরিকায় চলে আসার দীর্ঘ সময়কালে দেশের সাংস্কৃতি অঙ্গনের নানান তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সেই দিনগুলি ছিলো মধুর আনন্দের আর গৌরবের। মড়ে পড়ে অমর নৃত্য শিল্পী বুলবুল চৌধুরী ও আফরোজা বুলবুলের কথা। ১৯৫৩ সালে বুলবুল চৌধুরী বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান করেছিলেন- ঢাকায়, করাচীতে এবং ইউরোপে। তাঁর একটি অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৫৫ সালে বুলবুল ললিতকলা

*১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস শহীদ মিনারে কবি শামসুর রহমান, ইকবাল বাহার চৌধুরী, এয়ার ভাইস মার্শাল এ. কে খোন্দকার, সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ এবং পিছনে রামেন্দু মজুমদার।*

১৯৫৬ সালে শান্তি নিকেতনের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় শ্যামা নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। শান্তিদেব ঘোষের পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে কনিকা বন্দোপাধ্যায় অংশ নিয়েছিলেন। নৃত্যে মুখ্য চরিত্রে ছিলেন উমা গান্ধী। ঢাকায় সেটাই ছিলো প্রথম নৃত্যনাট্য এবং শান্তি নিকেতনের প্রথম অনুষ্ঠান।

বুলবুল একাডেমীর প্রযোজনায় ঢাকায় কবি জসিমউদ্দিনের 'নক্সী কাথার মাঠ' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয় অত্যন্ত সফলভাবে। জি এ মান্নান নৃত্য পরিচালনা করেন আর সঙ্গীত পরিচালনা করেন খাদেম হোসেন খান। রাহিজা খানম (ঝুনু) ছিলেন প্রধান নারী চরিত্রে।

*পশ্চিম বাংলার মূখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর দপ্তরে।*

পরে এই নৃত্য নাট্য ইরান ও ইরাকে পরিবেশিত হয়। তখনকার আমলে বিদেশে এই প্রথম সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে। ইরানের শাহ সস্ত্রীক এই অনুষ্ঠান দেখতে আসেন।

অতীতের এবং এখনকার অনেক কথাই বললাম। ডুয়াফির কর্ম তৎপরতা সংস্কৃতি চর্চ্চা আমাদের এখনকার সমাজকে বিশেষত: ছাত্র সমাজকে সত্য আর সুন্দরের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে বিদেশীদের কাছে বাংলাদেশকে পরিচিত করায় সাহায্য করবে– এই কামনা করি।

*ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের সাথে*

*লাহোর ১৯৬৮ ঃ রেডিও, টিভি, চলচ্চিত্র আর থিয়েটারে বিশেষ অবদানের জন্য Medjid Al Makky National Award বিজয়ীদের সাথে শামীম আরা (চলচ্চিত্র), নাদিম (চলচ্চিত্র), ইকবাল বাহার চৌধুরী (টিভি), ফতেহ লোহানী (রেডিও)*

*১৯৬০ সাল রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা শাহবাগ স্টুডিও নাটক। শিল্পী হুসনে আরা, কামেলা খান মজলিশ, সাবিয়া মুহিত, আবদুল মতিন, আবেদা বানু, কাজী নূরুস সোবহান, লিলি চৌধুরী, নূরুল্লা, কাফি খান, খুরশিদী আলম, এ ওয়াদুদ, শরফুল আলম (প্রোযাজক), সুলতান আহমেদ, মধুরী চট্টোপাধ্যায়, ইকবাল বাহার চৌধুরী, সৈয়দ তমা হোসেন, সাখাওয়াত, সুমিতা দেবী, নমিতা আনোয়ার, সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন।*

# স্মৃতির বালুকাবেলায়

লায়লা হাসান

সেই ছোটবেলায় ক্লাশ থ্রী-ফোর এ পড়ার সময় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে জড়িত আমি, আমরা। এসএম হলে নাটক, ইকবাল হল ও ফজলুল হক হল ইতাদি, আরো অনেক হলে নাচ, আবৃত্তি করতাম সেই সময় থেকেই।

মনে পড়ে সে সব স্মৃতি-স্কুল থেকে ফিরেই হুঠোপাটি করে তৈরী হয়ে নিচ্ছি- ঠিক সময়েই অভিনয় শিল্পী শ্রদ্ধেয় ওবায়দুল হক সরকার ভাই চলে এলেন রিহার্সাল এ নিয়ে যাবার জন্য। সাথী হলেন আমার বড়ভাই ফজলে রাব্বী হাসান (মনু) ও শামীম কামাল (কবি সুফিয়া কামাল এর বড় ছেলে), তখন প্রায় নাটকেই আমরা একসাথে অভিনয় করতাম- তিন ভাইবোন হয়ে বা অন্যান্য চরিত্রে।

বাদল ভাই রিক্সা ডেকে উঠে বসলেন আমাকে কোলে বসালেন, ভাই বসলো শামীম ভাইয়ের কোলে। রওনা দিলাম-পৌঁছালাম "কেরাণীর জীবন" নাটকের মহড়ায়। এখনো একটি সংলাপ কানেবাজে দাদী, কিংবদন্তী অভিনয় শিল্পী এডভোকেট কামরুন নাহার লাইলী তার (ছাত্রী ছিলেন) সংসারের অভাব অনটনের টানাপোড়নে নাতনীকে তিরস্কার করে বলছেন "জন্মেই তো বাবাকে খেয়েছিস" অর্থাৎ আমি অনাথ। আরেকজন শক্তিময় অভিনয় শিল্পীর কথামনে পড়ছে শ্রদ্ধেয় ফরিদা বারি মালিক, যতদূর মনে পড়ে উনি গানও গাইতেন দারুণ সম্ভবত: রবীন্দ্রসঙ্গীত।

মনে পড়ে ইকবাল হলে আমি নিজে বানিয়ে বানিয়ে নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতার সাথে নেচেছিলাম। এখন ভাবতে অবাক লাগে কতবড় দু:সাহস আমার ক্লাশ এইটের ছাত্রী আমি এ কবিতার কতটুকুই বা বুঝি? কতটুকু বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল? এরপর বহুবছর পরে ১৯৮৮ সালে যখন সঙ্গীত পরিচালক আমীনুর রহমান নিঝুর আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিচালনায় "বিদ্রোহী"র নৃত্যরূপ দেই বা নির্দেশনা দেই, তখন বোঝার জন্য আমাকে পৌরানিক অভিধানের সাহায্য নিতে হয়েছিলো। নাচের অনুষ্ঠানগুলোতে আমন্ত্রণ জানাতে অনেকেই সে সময় বাড়ীতে আসতেন আম্মার অনুমতি নিতে, তাঁদের মধ্যে মনে পড়ে বুলবুল আহমেদ (নায়ক পরবর্তীতে)। অভিনেতা গায়ক নাজমুল হুদা বাচ্চুকে বিশেষ করে মনে পড়ছে, বাচ্চু ভাইয়ের "এই চম্পানদীর তীরে" "নাচে নাচে ইরানী মেয়ে নাচে" আরো বহুগানের সাথে বিভিন্ন হলের অডিটরিয়ামে, কার্জন হলে নাচ করেছি। এর মাঝে সময় গড়িয়ে গেছে বহুদূর। একসময় ১৯৬৯ সাল এ ছাত্র হলাম দর্শন বিভাগের। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি অতি সহজ ব্যাপার ছিল, এতো পরীক্ষা এতো প্রতিযোগিতা ছিলনা। আমি তখন বিবাহিত জীবন যাপন করছি, এক কন্যা সন্তানের মা (পরবর্তীতে এই কন্যাও দর্শন বিভাগের ছাত্র ছিল, সঙ্গীতা ইমাম) সংসার নিয়ে বেশ আছি, মেয়ে নিয়ে শাশুড়ি অন্যান্য আত্মীয় স্বজন (একান্নবর্তী পরিবার) মহা আনন্দে দিন কাটছিল, কিন্তু বাবার বাড়ি শ্বশুর বাড়ি, স্বামী সবার তাগাদা তাড়াতাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য।

হঠাৎ একদিন স্বামী (সৈয়দ হাসান ইমাম, অভিনেতা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন দেবার বই ও কিছু কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললেন– "এই নাও, এখন তুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী"। আমি তো অবাক-জানলাম আমার মার্কশিট নিয়ে গিয়ে আমাকে ভর্তি করে দিয়ে এসেছেন, খরচ সর্বসাকুল্যে ১৫০/২০০ (খুব সম্ভবত) টাকা, মাসিক বেতন ১৫/-। শুরু হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জীবন।

প্রথমেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমাদের দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান শহীদ শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র দেবকে, যিনি ১ মার্চ '৭১ এ আমার 'ভাইবা' পরীক্ষা নিয়েছিলেন আর নির্মমভাবে শহীদ হয়েছিলেন বর্বর পাকিস্তানীদের হাতে ২৫ মার্চ রাতে। আরো স্মরণ করি শ্রদ্ধেয় সৈয়দ কামরুদ্দীন হোসাইন স্যার, জহুরুল হক স্যার, আখতার ইমাম আপা, হাসনা আপা আরো অনেক পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দকে। এরা সবাই আজ অনন্তলোকের যাত্রী। এখনো যাদের সান্নিধ্যে স্নেহে আপ্লুত হই বিভাগীয় অনুষ্ঠানে, এলামনাই অনুষ্ঠানে তাঁরা হলেন অতি প্রিয় বক্তা শ্রদ্ধেয় আমিনুল ইসলাম স্যার যাঁর প্রাঞ্জল সাবলীল সহজ ভাষায়

দীর্ঘ বক্তৃতা শ্রোতাদের চুম্বকের মত আটকে রাখে, হাসির হুল্লোড় পড়ে যায় মিলনায়তনে। দেখা হলেই পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে তাঁর আশ্চর্য ভালোলাগা কথাগুলো শুনি, অভিভুত হই। আরও একজন প্রিয় স্যার যিনি সদ্য পাশ করে অধ্যাপনার সাথে যুক্ত হয়েছেন, সুদর্শণ, সলাজ তরুণ, ক্লাশের বাইরে তাঁর রুমে যেকোন সময় যে কোন কাজে সাহায্যের হাত সুপ্রসারিত ছিল ছাত্রদের জন্য, তিনি হলেন আমাদের স্মিত হাস্য মিত ভাষ্য নীরু কুমার চাকমা স্যার। এই শেষবার ২০২২-এ দর্শণ বিভাগের যে পূণর্মিলনী উৎসব হলো সেখানেও দেখা পেলাম তাঁর।

আমি রোকেয়া হলের সাথে সম্পৃক্ত (অনাবাসিক) ছিলাম, তাই রোকেয়া হলের সমস্ত সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথেও জড়িত ছিলাম, নাচ করতাম, নির্দেশনা, প্রশিক্ষণ দিতাম, মঞ্চস্থ করতাম। শামসুন নাহার হলেও পরবর্তীতে আমন্ত্রিত নৃত্য বিচারক বা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হয়ে গেছি। শুধু হলের নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল অনুষ্ঠানমালায়ও নিয়মিত অংশগ্রহণ ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ আয়োজিত সৈয়দ হাসান ইমাম পরিচালিত রবীঠাকুরের "রক্ত করবী"তে বাংলা একাডেমীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে প্রায় দশ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে অংশগ্রহণ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদের আমি ছিলাম নির্বাচিত সাংস্কৃতিক সম্পাদক (ছাত্র ইউনিয়ন), আমার বিপক্ষে ছিল, ছাত্রলীগের স্বনামধন্য প্রথিতযশা সুকণ্ঠী গায়িকা, যিনি দুইশত ভোটে পরাজয় বরণ করেন। মনে পড়ে হলের সেই মধুময় সোনালী দিনগুলোর কথা, এমন কোনদিন বোধহয় যায়নি যে একটিবার হলে ঢু মারিনি। মালেকা বেগম আপা, আয়শা খানম, রীনা (রাশেদা), আভা, নিভা, মমতা, রাখী আরো কত বড় বন্ধু ছোট বন্ধু। সহপাঠিদের সাথে আড্ডা, গল্প- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক সপ্তাহের প্রতিযোগিতা ইত্যাদির পরিকল্পনা আরো কত বিষয় ছিল আমাদের গল্পের।

নির্বাচন এর (হল সংসদ) দু'দিন আগে থেকে বাড়ি ছেড়ে হলেই দিন কাটিয়ে রাতে বাড়ি ফিরি। নির্বাচনের দিন আর বাড়ি ফিরিনি, দু'বছরের শিশু কন্যা সঙ্গীতাকে শাশুড়ী মায়ের কাছে রেখে হলে থেকে গেছি। মধ্যরাত পর্যন্ত আমাকে নিয়ে প্রত্যেকটি রুমে রুমে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেয়া- আমি সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী, আমাকে যেন সবাই ভোট দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার চাইতে ওদের আগ্রহই বেশি ছিল যেন। কত যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি, নাচ করেছি সবার সহযোগিতায়। সে রঙ্গীন দিনগুলো আবারো ফিরে পেতে ইচ্ছে করে। ১৯৭১ এর ফেব্রুয়ারিতে এম.এ পরীক্ষা শেষ, ১ মার্চ ভাইবা পরীক্ষা। দুরু দুরু বুকে সকাল বেলা গেলাম পরীক্ষা দিতে- সব স্যাররা বসে আছেন। ভাবছি কে কি প্রশ্ন করবেন, উত্তর দিতে পারবো কি পারবো না– হঠাৎ বিভাগীয় চেয়ারম্যান জি সি দেব স্যার বলে উঠলেন "তুমি তো ফেল, তোমাকে পাশ করানো যাবে না", আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো যেন- সংসার, বাচ্চা, সামাজিক দায়িত্ব সব সামলে এত কষ্ট করে পড়াশোনা করলাম বাবা মা, শাশুড়িমা স্বামীকে খুশী করবার জন্য, এই তার ফল? আমি হতভম্ব হয়ে সব স্যারদের ভাব বোঝার চেষ্টা করছি তাঁদের কি বক্তব্য। এমন সময় দেব স্যার বললেন- "তোমাকে বলেছিলাম তোমার স্বামীকে নিয়ে এসে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য, দেখা করাবার জন্যে, তুমি তা করোনি, সুতরাং পাশ হবে না।" আমি দোষ স্বীকার করে মাফ চেয়ে কথা দিলাম স্যারকে যে আমি আমার স্বামী চিত্রনায়ক সৈয়দ হাসান ইমামকে একদিন নিয়ে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করাবো। স্যার বললেন– ঠিক আছে, পাশ। সেই আমার ভাইবা পরীক্ষা। আর কোনো প্রশ্ন নয়। এখানে উল্লেখ্য স্যার প্রায়শই আমাকে এ বিষয়ে বলতেন- ওনাকে নিয়ে আসবে, দেখা করাবে"। আমি বেশী গুরুত্ব দেইনি, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীকে নিয়ে আসা, যিনি রূপালি পর্দার মানুষ! স্যার যে এ ব্যাপারটা মনে রেখেছেন বা রাখবেন তা কল্পনাতীত। পরীক্ষা শেষে যথারীতি হলে এলাম, এখানেই শুনলাম বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা। গঠিত হলো "বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ"– নেতৃত্বে ছিলেন সর্বজনাব কবি সুফিয়া কামাল, সঙ্গীতজ্ঞ ওয়াহিদুল হক, সঙ্গীতজ্ঞ আতিকুল ইসলাম প্রমূখ, আহ্বায়ক সৈয়দ হাসান ইমাম। সে ভিন্ন প্রসঙ্গ।

আজো আমি এক অপরাধবোধে ভুগি- আমি দেব স্যারকে দেয়া কথা রাখতে পারিনি। ২৫ মার্চ রাতে আমাদের দর্শন বিভাগের রত্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন দার্শনিক শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র দেব শহীদ হলেন।

জাতির পিতার আহ্বানে বাংলার জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়লো মহান মুক্তিযুদ্ধে। নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লাখো শহীদের রক্তে ও মা-বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ- বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা।

বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আরো বেগবান হলো। আমরা মহান একুশকে ঘিরে মঞ্চস্থ করেছি একুশ আমার অহংকার "প্রদীপ জ্বালি একুশ স্মৃতির" ইত্যাদি অনুষ্ঠানমালা। শুধু তাই নয় মহান মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নৃত্যনাট্য "রক্তের আখরে মা ও মাটি" "মায়ের আচলে এলো স্বাধীনতা" ইত্যাদি মঞ্চ করেছি। এছাড়া ডাকসু আয়োজিত নানান অনুষ্ঠানে আমরা কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলাম। আবুল হাসনাত, মুফিদুল হক, ম. হামিদ, নন্তু আরো অনেক ছাত্রদের সহযোগিতায় আমরা একের পর এক নৃত্যানুষ্ঠান, নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করে যাচ্ছি টিএসসি, সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান, বিশ্ববিদ্যালয় 'মল' প্রাঙ্গনে। একটি নৃত্যনাট্য

যেটি অত্যন্ত সাড়া জাগিয়েছিল, সেটি হলো "নবজীবনের গান"। জীবনঘনিষ্ঠ এই নৃত্যনাট্যটিতে অংশগ্রহণ করেছিল নিগার চৌধুরী, শর্মিলা দাশ (বন্দোপাধ্যায়), জামাল আহমেদ লাভলু, মঞ্জুর চৌধুরী, আসমা খানম, এ্যানী, কুমকুম ভূঁইয়া, দীপা দাশ (খন্দকার) রেখা দাশ, স্বপন দাশ, ডালিয়া আক্তার, অনুপ কুমার দাশ, হাসান ইমাম (আবু), আক্তার আহমেদ, লায়লা হক, মাইদুল ইসলাম গেদু প্রমুখ।

এছাড়াও রবীঠাকুরের অনেক কবিতার নৃত্যরূপ দিয়েছি যেমন "বৈশাখ" "১৪০০ সাল", নজরুলের "বিদ্রোহী" "সিন্ধু" ইত্যাদি। আমরা আরো মঞ্চস্থ করলাম কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের "রানার" "অবাক পৃথিবী", "প্রিয়তমাসু" ইত্যাদি বহু নৃত্যনাট্য। কখনো রোকেয়া হলের অনুষ্ঠান, কখনো দর্শন বিভাগের এলামনাই এর অনুষ্ঠান নিয়ে মহাব্যস্ত আমি। নৃত্য পরিবেশন থেকে নির্দেশনাই দিতাম বেশি।

'৮০ দশকে লিয়াকত আলী লাকীর তত্ত্বাবধানে প্রচুর কাজ করেছি। এ সময় ডাকসু আমাকে সম্বর্ধনা দিয়ে সম্মাননা জানায়। রোকেয়া হলের নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানটি- নাচলাম "পুরানো সে দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়, সেকি ভোলা যায়"...

সত্যিই বহুদিন না দেখা অনেক মুখগুলো দেখে আবেগে আপ্লুত হলাম, অভিভূত হলাম- "সেকি ভোলা যায়"? এরপর সিনেট সদস্য হলাম দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে, সে আরেক অভিজ্ঞতা, রোমাঞ্চিত হলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন এর জীবন সদস্য হয়ে জড়িয়ে পড়লাম এর বিভন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে। আমাদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানগুলোতে বহু আগের ছাত্রদের সমাগম হয়, যাঁরা এখন একেকজন বিশাল ব্যক্তিত্ব, পথিকৃৎ, মহীরুহ। তাঁদের দেখে নিজেকে ধন্য মনে করি, শ্রদ্ধায় আনত হই। আমাদের দর্শন বিভাগের পুনর্মিলনী আয়োজনেও পুরনো সহপাঠিদের সাথে পুনর্মিলন ঘটে, হারিয়ে যাই ছাত্রজীবনের মধুর দিনগুলোতে। এসময়ে বোধকরি আমরাই সবচাইতে পুরোনো ব্যাচ- '৭০ দশকের।

২০১০-এ একুশে পদক প্রাপ্তিতে আমার বিভাগ সম্মাননা জানালো- আমি কৃতজ্ঞ, আনন্দে আপ্লুত।

আজো আছি ঢাবি'র নানা কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। বিশেষ করে আমাদের নৃত্য বিভাগ প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকে। ২০০৯ এ আমরা, বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্বতন্ত্র নৃত্যকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিই। আমি তখন নৃত্যশিল্পী সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে চেষ্টা তদ্বির করে, মাননীয় ভিসি আরেফীন সিদ্দিকীর সাথে মিটিং সিটিং, ডীন জনাব সাদরুল আমীনের কাছে ধর্না দেয়া, এরপর একাডেমীক কাউন্সিলের মিটিংগুলোতে স্যাররা (আমাদের পক্ষের) যেন উপস্থিত থাকেন সেটা ফোন করে মনে করিয়ে দেয়া। আমাদের সাথে থাকার জন্য চেয়ারম্যানদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে অনুরোধ করা, বন্ধ দরজার তলা দিয়ে চিঠি পৌঁছে দেয়া আরো কত কি করেছি। নাট্যকলা বিভাগ, সঙ্গীত বিভাগের সহযোগিতার জন্য চেয়ারম্যান জনাব রহমত আলী, অনুপ ভট্টচার্যের সাথে দীর্ঘ কথোপকথন, বিভিন্ন সময়ে তাঁদের পরামর্শ নেয়া। মঞ্জুরী কমিশনের মহাপরিচালক সর্ব জনাব আজাদ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম এর কাছে অর্থ বরাদ্দ দেয়ার জন্য বারবার যাওয়া ও অনুরোধ করা। প্রো: ভিসি নাসরীন আহমেদ এর সাথে সাক্ষাৎ ও পরামর্শ নেয়া ইত্যাদি সব কিছুর পর ২০১৪ সালের জুলাই মাসে ঢাবিতে প্রতিষ্ঠিত হলো আমাদের স্বপ্নের নৃত্যকলা বিভাগ।

প্রায় পাঁচ বছরের সাধনার ধন আমাদের নৃত্যকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার পেছনে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য, যাকে সবসময় সব কাজে পাশে পেয়েছি, সার্বক্ষণিক সহযোগিতা পেয়েছি তিনি অধ্যাপক ইস্রাফিল শাহীন, তৎকালীন নাট্যকলা বিভাগের প্রধান। শেষ মুহূর্তের কাণ্ডারী আরেকজন ছিলেন- প্রো-ভিসি ড. নাসরীন আহমেদ। মাননীয় ভিসির সদয় সহযোগিতা পেয়েছি সব সময়, যখনই মিটিং করতে চেয়েছি কখনো ফেরাননি আমাদের, আর যাঁর সাহায্যের কথা উল্লেখ করতেই হয় তিনি ভিসি সাহেবের সহকারী সিদ্দিক সাহেব, ফোনটা উনিই রিসিভ করতেন এবং ভিসি সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করতেন। জনান্তিকে বলি সে সময় আমি ঢাবি'র সিনেট সদস্য ছিলাম তাই হয়তো ওঁদের সদয় সহানুভূতি পেয়েছি প্রচুর। নৃত্যকলা বিভাগের "শিক্ষক নিয়োগ কমিটির সদস্য নির্বাচিত করে তাঁরা যে সম্মান দিয়েছেন আমাকে, তাতে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

এভাবেই সেই স্কুল জীবন থেকে যাপিত জীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত আজো জড়িয়ে আছি এবং থাকবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে। এই প্রাঙ্গণে আসা-যাওয়ার অর্ধশত বৎসরেরও বেশী হয়ে গেল।

ঝাপসা স্মৃতি, সবকথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে বাঁধা হবার কারণে ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

*(একুশে পদকপ্রাপ্ত, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব)*

# Bangladesh's Economy: Growth With Fault Lines

**Dr. Syed Akhtar Mahmood**

I was privileged to study and teach at the Economics Department of Dhaka University. Over the years, the products of this department, whether working in the Dhaka University or elsewhere, have made major contributions to help enhance our understanding of Bangladesh's economyand design strategies and policies for economic development. Before I go to the subject of my topic, which is about strategic priorities for the future, let me discuss briefly some historical contributions of the economists associated with Dhaka University.

**A look into history**

During the 1950s, there was increasing concern about rising economic disparity between East and West Pakistan – a concern shared by economists, politicians and the broader society. At the core of the disparity issue was inequitable allocation of public resources between the two provinces of Pakistan. Public investment, i.e., the projects done by government, were concentrated in West Pakistan. The Pakistani establishment justified this skewed allocation on the grounds that West Pakistan had a better capacity to absorb the investment. In other words, economic growth would be greater if investments were concentrated in the western wing of the country, and East Pakistan will benefit from the trickle-down effect of that growth.

This view was strongly contested by the Bengali economists. One of their most consequential statements came in the mid-1950s. Incidentally, Dhaka University has an association with this. In 1956, a special conference was held in Dhaka University to discuss the draft first 5-Year Plan of Pakistan (1956-60). Following that conference in August 1956, a group of eight Bengali economists, some of whom were professors of the Economics Department at Dhaka University, put forward the "Two Economy" thesis. The group included Professor Nurul Islam, who was a long-time resident of the Washington DC area and a patron of DUAFI.

This thesiscontained arguments which debunked the trickle-down theory put forward by the Pakistani establishment and helped frame the public discourse on disparity for the next decade and a half. The "Two Economy" thesis was based on an important economic concept, i.e., that of factor immobility. Since the two provinces of Pakistan were geographically separated by 1000 miles of Indian territory, East Pakistanis could

not easily move to West Pakistan to take advantage of growth there. This meant that the two provinces of Pakistan effectively had two separate economies and the trickle-down effect that happens in an integrated economy was not going to happen in Pakistan. East Pakistan thus needed the resources to grow on its own instead of waiting for the elusive trickle-down effect from West Pakistan. The economists argued that the planning exercises of Pakistan, in particular decisions regarding resource allocation between the two provinces, should take this into account.

The idea of the two economies spread like wildfire. Economists publicized the thesis and its implications through writings in the media, and through seminars and conferences. Themessages reached the politicians. It helped shaped their political positions and demands regarding economic disparity in Pakistan and the need for greater autonomy to the provinces (such as in the famous Six-Point charter of demands presented by Sheikh Mujibur Rahman in June 1966). By early 1969, after the fall of Ayub Khan, when there was talk of elections to form a new government (the elections were held in late 1970s), Bengali politicians realized that an opportunity may arise to prepare a new constitution based on the Six-Points. They sought out the economists to draw out the detailed implications of the Six-Points.

The role of Bengali economists in the Pakistan of the 1950s and 1960s provides a good case study of the role of economists within a political setting, and of the interaction of economic research and analysis with burning political issues. It also tells us that economic disparity is a critical issue with significant political implications and must be addressed based on evidence and good analysis. We shall come back to this theme later in this article. The Pakistani establishment took the view that Bengalis can't make good use of resources given to them. Bangladesh's performance after independence has proved them wrong.

**Bangladesh's growth trajectory since independence**

Bangladesh's birth fifty-two years ago was greeted with considerable pessimism. It was termed an international basket case, likely to depend forever on the largesse of others, and a test case of development. Bangladesh lacks natural resources and does not score well on conventional indicators of governance. Its percentile score on the World Bank's Government Effectiveness Indicator (one of the six indicators in the World Bank's Worldwide Governance Indicators (WGI)) was about 23 in 2012, 2017 and 2022. In the early years, Bangladesh suffered from frequent food shortages and a severe lack of foreign exchange for buying food and other necessary imports. Agriculture was dominated by one crop, rice, whose productivity was low. The industrial sector was small; its growth constrained by lack of capital, entrepreneurs, and foreign exchange.

Economic growth was indeed poor and unstable in the 1970s, and steady but modest in the 1980s. However, the economy took off at the turn of the century and growth accelerated in recent years. In the decade preceding the Covid 19 pandemic Bangladesh's economy grew at 6.5 percent per annum. During the pandemic, it was one of the few countries to experience positive growth. In 2000, about half the population lived below the poverty line. By 2022, this figure had dropped to 19 per cent.

This happy story of remarkable growth accompanied by substantial reduction in poverty got a huge jolt in July-August 2024. A government, firmly entrenched in power for a decade and half, collapsed in the face of a popular movement led by students. This came as a huge surprise to both Bangladeshis and the rest of the world.

Two questions are thus raised: a) How is it that a country once termed a "basket case", and burdened with poor initial conditions, is now en route to becoming a middle-income country?; and b) How does one explain this dramatic turn of events in July-August 2024 given Bangladesh's successful development record?

I argue that the two developments are not unrelated. The growth process itself, including its political management, generated some fault lines. The remarkable growth gave rise to cronyism and privilege seeking. This, in turn, distorted the policy regime and depleted development resources. Faulty policies meant that rising aspirations triggered by rapid growth were not met. These created pre-conditions for the dramatic events of July-August 2024.

How did Bangladesh achieve the growth that it did? Several factors were at play. Bangladesh made reasonably good use of the two visible resources it had, land and labor; the first by increasing agricultural productivity and the second through international migration and labor-intensive manufactured exports (primarily garments). At the same time, Bangladesh also harnessed a resource that was hidden, i.e., the creativity and entrepreneurial talents of its people. Entrepreneurship and creativity were unleashed in waves.

A large part of the population who took risks and became entrepreneurial did so because of the difficult conditions in which they lived – they simply had no choice but to be so. But they were also people of limited means and education, often operating at or near subsistence level. Their access to information was also limited. Thus, they needed extra push. This came from government.

Contrary to what many observers suggest, development in Bangladesh did not happen despite the government. The public sector did play an important facilitating role. But successive governments were handicapped by inadequate capacity, poor governance, and unstable politics. Transitions from one administration to another have rarely been

smooth. Government functionaries, from top policy makers to front line officers, suffered from risk averseness. A pragmatic government understood these limitations and, instead of going for bold initiatives, opted for an incremental and adaptive approach to policy making. I am not talking about a particular government here. What I am saying applies to different governments in power since independence.

The incremental and adaptive approach of the government, as it responded to the needs of an entrepreneurial and increasingly aspiring nation was, in turn, shaped by a class of policy advocates/intermediaries. These included economists and other professionals, business organizations, development partners and the media – players in the world of ideas, debates and dialogues.

The harnessing of latent resources, such as the entrepreneurial talents and creativity of the people, and visible resources such as land and labor, was not enough to generate the high growth achieved by Bangladesh. The country also exploited a diverse set of synergies, which played out in both the economy and in the policy domain. A set of small, but synergistic, developments triggered substantial changes.

Bangladesh's significant growth performance has been accompanied by the development of a few fault lines that may threaten the sustenance of this growth. These fault lines also played a role in creating the popular disaffection that added fuel to the student movement on July-August 2024, leading to the downfall of the 15-year-old Awami League government.

**The fault lines**

While growth has been accompanied by substantial reduction of poverty, its fruits have not been distributed equitably. Income distribution, which had worsened earlier,remains unequal. The Gini coefficient (consumption), a measure of inequality, rose from 25.9 in 1983 to 33.4 in 2000 and remained at roughly that level since then.

Moreover, the growth process has failed to create adequate jobs for the educated youth of the country. Rising youth aspirations, buttressed by growing family incomes, has led to an explosion in university enrollments – the number of enrolled graduate students increased by 3.5 times between 2000 and 2021. At the same time, unemployment rates are high and rising for tertiary education, jumping from 6.7 percent in 2013 to 12 percent in 2022.This may be compared to the national unemployment rate of 4.3 percent and 3.5 percent respectively. However, this relatively low unemployment rate masks the fact that about 85 per cent of the employed workers are in the informal sector, which is characterized by low productivity and incomes, insecure jobs and difficult working conditions.

Bangladesh's human capital remains low. According to the World Bank's Human Capital Index for 2020, children born in Bangladesh will be 46 percent as productive

when they grow up as they could if they enjoyed complete education and full health. When the prospect of employment is considered, the figure drops to 27 per cent. These figures may be compared to 69 per cent and 56 per cent respectively for Vietnam.

While Bangladesh has witnessed a remarkable unleashing of the entrepreneurial spirit and successfully made a mark in global markets as a leading exporter of garments, it is handicapped by an undiversified export basket and a declining export/GDP ratio. Bangladesh's export/GDP ratio peaked at 20 per cent in 2012 and then steadily declined to reach 13 percent in 2022. That year, Vietnam's export/GDP ratio was 94 percent.

Ready-made garments currently account for 84 percent of Bangladesh's exports. By contrast, South Korea started diversifying into more complex products within 15-20 years of initiating its export-oriented development strategy. In 1995, both Vietnam and Bangladesh had electronic goods exports that were less than 1 per cent of their total exports. For Bangladesh, that proportion remains the same while for Vietnam, electronics currently account for almost 40 per cent of its exports. Moreover, much of Bangladesh's manufacturing sector, including garment manufacturing, has a low level of technological sophistication. As a result, productivity is low.

The ability to address these fundamental challenges has been weakened by several governance challenges, including the rise of crony-capitalism, deteriorating financial sector governance and weak fiscal management. The tradition of dialogue that had allowed the world of ideas to shape the world of policy in the past has been diluted. The rise of a powerful business-politics nexus has weakened the relative autonomy of the government vis-à-vis business.

**Looking forward**

As we look ahead, we must address the above challenges that Bangladesh faces as it embarks on a journey towards an aspired upper middle-income status. At a fundamental level there is a dual challenge that will define our economic strategy for the future. We must generate, on a largescale, remunerative jobs for the millions of unskilled and semi-skilled workers, while also beginning the transition towards an economy based on knowledge and skilled labor. Our best asset remains the entrepreneurial talents and creativity of our people. This asset should be brought to bear to address these twin challenges. The incremental policy approach that paid rich dividends in the first fifty years after independence may remain relevant but will require a move towards a more performance-oriented government and a productivity-oriented private sector to sustain Bangladesh's remarkable growth performance.

# C&T Home Care

*Home care you can trust*

HAVE A **FAMILY MEMBER** OR **FRIEND** TAKE CARE OF YOU INSTEAD OF A STRANGER

**Guaranteed Byweekly Payment**

EARN MONEY FOR TAKING CARE OF YOUR FRIENDS AND RELATIVES

## LOCATION

**7925 Jones Branch Dr, Suite LL 120 McLean, Virgina 22102**

## CONTACT

**(301)-312-0045**

**www.CANDTHOMECARE.com**

**va@candthomecare.com**

# প্রফেসর কামাল

**ড. আশরাফ আহমেদ**

‘হায় রে হৃদয়, জীবনের সঞ্চয়

দিনান্তে নিশান্তে পথপ্রান্তে শুধু ফেলে যেতে হয়।’

বয়স হয়েছে। দুনিয়াদারির মায়া ত্যাগ করার ইচ্ছায় পুরনো অনেক লেখা ও কাগজপত্র বেরিয়ে এলো, যা যক্ষের ধনের মতো এতো বছর আগলে রেখেছিলাম। খুব প্রিয় ছিল সেগুলো। কিন্তু আজ সেসব ছিঁড়ে ফেলতে হবে। তেমন একটি ফাইলে জমা ছিল বেশ ক’টি ব্যাংকচেক ও চিঠি, ১৯৯৪ সাল থেকে। এ তো শুধু কাগজ ছিঁড়ে ফেলা নয়। হৃদয়ের এক একটি তন্ত্রীকে টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলার মতো!

অধ্যাপক কামাল আহমাদ পাকভারত উপমহাদেশের প্রথম প্রাণরসায়ন বিভাগটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৬ সালে এবং পরবর্তী প্রায় কুড়ি বছর ধরে এর পরিচর্যা করে দেশের একটি অন্যতম প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। এই বিভাগকে সূতিকাগার হিসাবে ব্যবহার করে তিনি ফার্মেসি বিভাগ এবং ইন্সটিটিউশন অব নিউট্রিশন এন্ড ফুড সাইন্স ও গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে এখান থেকেই অণুজীববিজ্ঞান বিভাগ ও জেনটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগও সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বা বায়োকেমিস্ট্রি সম্পর্কিত যতগুলো বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে সেই সবেরও আঁতুরঘর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগ বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

অধ্যাপক কামাল বাংলাদেশের এবং বহির্বিশ্বের একজন উঁচুমানের বিজ্ঞানীও ছিলেন। চল্লিশের দশকে উইসকিনসন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ তিনি আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি জার্নালে (JACS) প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, যা আজকের জন্যও খুব দুরূহ। তিনি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমাণ উন্নয়নের জন্য যে ঐতিহাসিক গবেষণার বিশাল কয়েকটি কাজ করেছিলেন, বলা যায় বাংলাদেশের বর্তমান পুষ্টিজ্ঞানের অনেকটাই তার ওপর ভিত্তি করে রচিত। শিক্ষক এবং প্রশাসক হিসাবে তিনি প্রচণ্ড ক্ষমতাধর ও মেজাজি ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি হওয়ায় আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর ছাত্র হবার।

আমি তাঁর প্রিয় ছাত্র কখনোই ছিলাম না। কখনো কখনো আমাকে পছন্দ করেন মনে হলেও অধিকাংশ সময়েই আমি তাঁর চক্ষুশূল ছিলাম বলেই মনে হতো। তবে ১৯৬৯-৭০ সালের কোনো এক সময় আন্দোলনের মুখে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্পকালীন উপাচার্যের পদে ইস্তফা দিতে হয়েছিল। তখন প্রাণরসায়ন বিভাগে ফিরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, আশরাফ তোমাদের ছেড়ে, এই বিভাগ ছেড়ে আমি আর কোথাও যাচ্ছি না। কিন্তু আমাকে অপছন্দ এতোটাই করতেন যে এমএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর তিনি আমাকে বাদ দিয়ে প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকারীকে বিভাগীয় শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দানের পক্ষে ছিলেন। তাঁর অপছন্দের অধ্যাপক আনোয়ার আজিম চৌধুরীর প্রিয় ছাত্র এবং তাঁর অধীনে আমি থিসিস গবেষণা করেছিলাম, সেটিই আপাতদৃষ্টিতে আমার অপরাধ ছিল। সেই বাঁধা কাটিয়ে প্রায় আমরা তিনজনই শিক্ষকতায় যোগদান করার পর কামাল স্যারের সাথে আমার সম্পর্কটি খুব মসৃণ না হলেও দৃষ্টিকটু বৈরীতাও ছিল না। ব্যক্তি হিসাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা না করলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এবং অগণিত ছাত্রছাত্রীর জীবনে তাঁর আকাশচুম্বী অবদানের জন্য তিনি কখনো আমার শ্রদ্ধা হারাননি। বাংলাদেশে এমন মেধার লোক তখন আমার চোখে কেউ ছিলেন না।

মাঝে মাঝে বিদেশ থেকে দেশে ফিরলে তিনি ভালো ব্যবহার করতেন এবং আমেরিকায় এলে প্রতিবার অবশ্যই ফোন করতেন এবং আমার সাথে এক বা দুদিন কাটাতেন। আমার বাসায় আতিথ্যও গ্রহণ করেছিলেন। ততোদিনে আমি তাঁর

কাজের সমালোচনা করার মতো সম্পর্কে পৌঁছে গেছি। বিদেশি সাহায্যে একটি বিশাল দালান নির্মাণ করে অসংখ্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সাজিয়ে বহু বছরের কঠোর পরিশ্রম করে যে ইন্সটিটিউট অব নিউট্রিশন তিনি স্থাপন করেছিলেন, একসময় অপমান নিয়ে সেখান থেকে বিতাড়িতও হয়েছিলেন। আমেরিকায় সারাদিনের জন্য আমার ল্যাব পরিদর্শনে এলে তাঁকে বলেছিলাম, ব্যক্তিগত ও শর্তহীন আনুগত্য পছন্দ করতেন বলে আপনি যোগ্যদের দূরে সরিয়ে যেসব অযোগ্য লোককে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, তারাই আপনার সাথে শত্রুতা করেছে তা নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পেরেছেন? তিনি বলতেন হ্যাঁ, তখন বুঝতে পারিনি কিন্তু আমি অবশ্যই ভুল করেছিলাম।

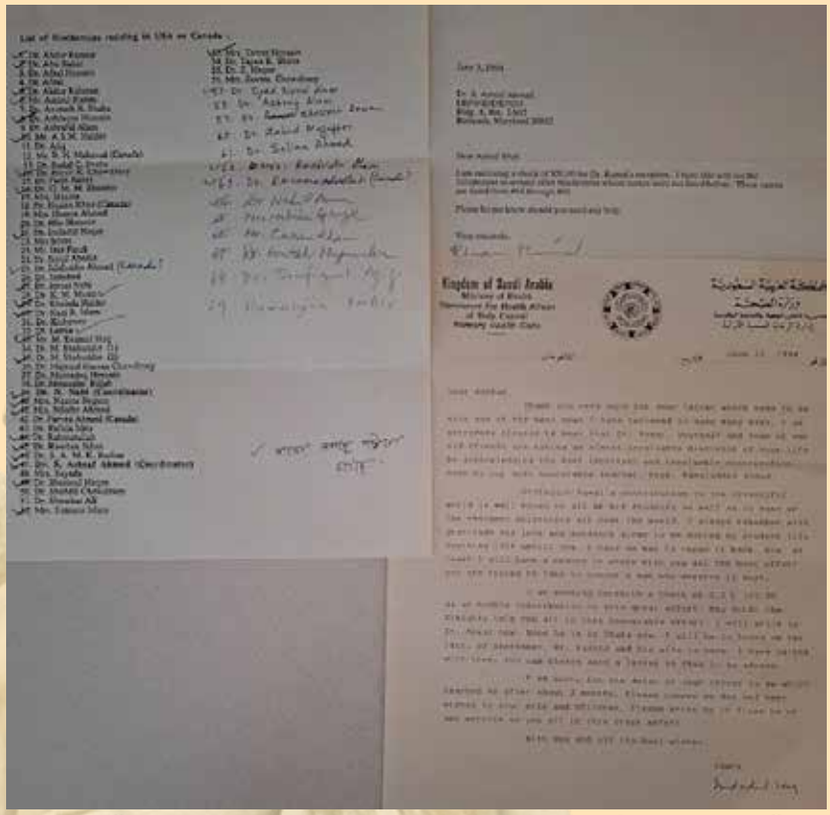

প্রতিবারই তাঁকে অনুরোধ করে বলেছিলাম, একটি মাত্র জীবনে আপনার মতো বিশাল বিশাল অর্জনকারী মানুষ শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা পৃথিবীতেও খুব বেশি নেই। এখন অবসরকালীন সময়ে আপনি দয়া করে সেসব অভিজ্ঞতা লিখে রাখুন। কী কী ভাবে আপনি সেসব সম্ভব করলেন, কী কী প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে হয়েছে সেসব লিখে রাখুন যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা পড়ে শিক্ষা নিতে পারে। উত্তরে প্রতিবারই তিনি চেষ্টা করবেন বলে কথা দিতেন।

কিন্তু কথা তিনি রাখতে পারছেন না দেখে আমি ভিন্ন চিন্তা করলাম। আমরা, তাঁর প্রাক্তন ছাত্ররা অধ্যাপক কামাল আহমাদের জীবনীর বিভিন্ন দিককে তুলে ধরে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলে কেমন হয়? লেখা সংগ্রহ ছাড়াও পুস্তিকা প্রকাশ করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন হয়। একটি বিষয় এখানে খোলাসা করে নেয়া ভালো। আমি যখনকার কথা লিখছি বাংলাদেশের তো বটেই বহির্বিশ্বে বাঙালিদের আর্থিক অবস্থাও আজকের তুলনায় ছিল অত্যন্ত করুন! যুক্তরাষ্ট্রে আজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে জনপ্রতি ২৫-১০০ ডলারের টিকেট অল্প সময়েই শেষ হয়ে যায়। অন্যদিকে নব্বইয়ের দশকে অনেক অনুনয় বিনয় করেও ২ ডলারের বেশি সবার থেকে আদায় করা যেতো না। কথাটি মোটেই বাড়িয়ে বলছি না। ১৯৯৬ সালের তেমন একটি প্রচারপত্র আমার সংগ্রহে আছে। তা হলে অধ্যাপক কামালের জীবনী সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশের অর্থের জোগান আসবে কীভাবে?

ঠিক করলাম যে বহির্বিশ্বে অবস্থানরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়নবিদদের কাছে আবেদন জানিয়ে একটি চিঠি লিখবো। পাঁচ সন্তানের সবাই যেহেতু আমেরিকায় বাস করে, অধ্যাপক কামাল কয়েক বছর পরপর এখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে যান। চিঠিতে পুস্তিকা প্রকাশ উপলক্ষ করে আমেরিকায় অধ্যাপক কামাল আহমাদকে সম্মাননা জানানোর কথাও লিখবো, সেটিই হবে বেশি আকর্ষণীয়। আশেপাশে অবস্থান করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগের প্রাক্তন কিছু ছাত্রের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করি। তাঁদের মাঝে অন্যতম ছিলেন এনআইএইচ-এ গবেষণারত আমার ছাত্রসম বর্তমানে প্রয়াত ও অত্যন্ত মেধাবী ডঃ শাহাবুদ্দিন এবং আমার সহপাঠী ও পার্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণারত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। শেষোক্ত জন বললেন কামাল স্যার যেহেতু প্রাণরসায়ন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা, সম্মাননা জানানোটা তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিভাগে হওয়াটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। আমি তাতে দ্বিমত করলাম না।

আনোয়ার ভাই নতুন করে চিঠির মুসাবিদা লিখলেন। তাতে আরো লিখলাম যে পুস্তিকা প্রকাশ ও অভ্যর্থনার স্থান ও ক্ষণ ঠিক না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের পাঠানো ব্যাংক চেক ভাঙ্গানো হবে না। আনোয়ার ভাই এবং আমার সই সহ সেই চিঠি প্রায় ৭০ জনের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম, কতোজনের কাছে পৌঁছাবে সে চিন্তা না করেই। বলে রাখা ভালো যে সেই জমানায় ইমেইল খুব অল্প লোকের নাগালে ছিল বিধায় বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহ করে রাখা ডাকঘরের ঠিকানায় চিঠিগুলো পাঠাতে হয়েছিল।

সেই দিনগুলোতে যেখানে দুই ডলার কারো পকেট থেকে বের করা যেতো না, আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে চিঠির প্রাপকরা ন্যুনতম পঁচিশ থেকে একশত ডলারের পর্যন্ত চেক পাঠিয়ে দিলেন! তাঁদের প্রিয় শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই তা করলেও আমাদের আহবানে এতো উদারচিত্তে তাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন বলে সবার প্রতি এক গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ করেছিলাম। এঁদের মাঝে ছিলেন আমার শিক্ষক ও প্রয়াত ডঃ এমদাদুল হক, কানাডাবাসী অধ্যাপক একরামুদ্দৌলা, আমার অনুজপ্রতিম খান মোহাম্মদ মুনীর, আবু বকর ও পরিতোষ মজুমদার, আমার ছাত্রী লামিয়া শারমিন ও নাইমা

আহমাদ এবং নাহিদা বানু, আরো কয়েকজন। আমাদের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে চেকের সাথে একজনের চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজনে মনে করছি। সৌদি আরবে কর্মরত ডঃ এমদাদুল হক বেশ বড় চিঠিতে লিখেছিলেন, Dear Ashraf, … I am sorry for the delay of your letter to me that reached me after about two months. … I am extremely pleased to hear that Dr. Anwar, yourself and some of our old friends are taking an almost invaluable decision of your life by acknowledging the most important and invaluable contribution made by our most honorable teacher, Professor Kamaluddin Ahmad.

আমাদের চিঠির মাস কয়েক পর ঢাকায় ফিরে গিয়ে অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ভাই জানালেন যে বিভাগীয় শিক্ষকদের মাঝে দলাদলির কারণে সেখানে কামাল স্যারকে সম্মান জানানোর কোনো অনুষ্ঠান করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে কামাল স্যারের আর যুক্তরাষ্ট্রেও আসা হয়ে ওঠেনি। ফলে অনেক কিছুর মতো আমার সেই পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাঝে দূরত্ব রয়েই গেল। ১৯২৩ সালে চট্টগ্রামে জন্ম নেয়া অধ্যাপক কামালউদ্দিন আহমাদ ২০০৪ সালে ম্যানিলায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিগত তিরিশ বছর ধরে মাঝে মাঝেই তখন পাঠানো অব্যবহৃত ব্যাংক চেক ও চিঠিগুলো সামনে এসেছে। প্রতিবার চিঠিগুলো পড়েছি এবং চেকগুলো হাতিয়ে হাতিয়ে প্রেরকের শব্দা ও ভালোবাসার স্পর্শ পেয়েছি। মনে মনে অধ্যাপক কামালের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছি। এঁরা সবাই ছিলেন আমার অতি প্রিয় ব্যক্তি। আজ অধিকাংশের সাথেই কোনো যোগাযোগ না থাকলেও স্মৃতিতে তাঁরা উজ্জ্বল। পৃথিবীর মায়া ত্যাগের প্রস্তুতি হিসেবে অনেক নিদর্শনের মতো আজ তাঁদের সাথে আমার বস্তুগত বাঁধনটুকুও ছিঁড়ে ফেলতে হবে। এ বড় কষ্টের কাজ।

১৬ই অক্টোবর, ২০২৪

# Results-based & Welfare-driven Research - Thoughts Outside The Box

**Dr. Mohammed Parvez Imdad**

"Dimensions of knowledge will never stagnate, should you keep windows of research open". (from one of my published articles).

Upgradation and broadening of research is certainly crucial for advancement of higher education. Over the past five decades, allocation and expenditures for research in higher education sector in Bangladesh reflects sharp decreases on average, despite marginal increases at times. For University of Dhaka, funds for research decreased to less than 6% of overall allocation, which is one of the lowest as compared to similar public universities in South Asia (15%) Southeast Asia (25%) This trend has adversely impacted not only quality and volume of research but has also deepened challenges in achieving effective higher education in Bangladesh. Several factors need to be taken into account to elevate research.Some of the key points for expansion of research are highlighted below:

**(a) Prioritizing Research policies & areas:**

It is essential to have relevant research policies based on priorities and requirements for specific subjects/areas in Dhaka University as well as other public universities.In this context,at the initial stages it would be pertinent to raise questions - Are our research initiatives working well? What are the key impediments to advancement of research? What can we do urgently to make things better with regard to research? The core thrust for research should aim at adding value to existing inputs for research and expected outcomes of academic analysis on one hand, and on the other facilitate means of further specialization in achieving academic objectives.

**(b) Research should be Demand-driven, Performance-focused and Welfare-driven:**

To bear significant results, Research should be based on demand for areas in which its objective and significance are aimed at reaching higher levels of professional development. This implies undertaking prior assessment to determine the demand and justification for specific research-related exercises. Supply of research inputs should also be catered to match the demand.Side by side, it is necessary to undertake performance reviews for sectors that receive research inputs. This could enable reaching due conclusion on whether funds and technical support for research are well catered to reaching appropriate conclusions.

**(c) Results-based and output- oriented reserach:**

Results and output indicators derived through research or research-related processes should be able to confirm the justification and effectiveness of research activities and programs,both in the public and private sectors.High-quality research outputs from Dhaka University and similar institutions could have a catalyst research-supportive role for such institutions.This will enable having in place a 'Research Cycle' matrix format for sector projects and programs.The proposed cycle could also be useful to track strengths and deficiencies through which efficient monitoring and evaluation will further be eased.

**(d) Need to focus on Public- Private Partnership on Advanced Research:**

Promotion of Public-Private Partnership (PPP) frameworks in higher education, mainly with the assistance of multilateral development institutions should be extremely useful. DU may consider finalizing Memorandum of Understanding (MOU)s on research- building and expansion networks with relevant ministries and agencies of the Government as well as with leading business and corporate entities. This will address deficiencies and constraints in program implementation and give accurate indication for efficiency in deployment of funds and expertise. This will expand potentials for making best possible use of crucial research programs to achieve institutional objectives.

**(e) Research Partnership Framework (RPF)s with External Academic Institutions:** DU Academic departments and institutes need to consider implementing Research Partnership Framework Agreements (RPF)s with regional and global academic and research institutions.This will give DU adequate access and leverage to benefit from research-related improvements in services and technologies in several developed and developing countries. Such partnerships should add impetus to diversification of research areas and facilitate research adaptation through updated IT infrastructure cyber security and Artificial Intelligence (AI). RPFs could also be integrated with research instruments undertaken by Regional Cooperation and Integration frameworks within Asia.

**(f) Can Citizens engagement in research platforms make a difference?** Despite research being viewed as a specialized domain, benefits of research could best be achieved through exchanging information with and disseminating research tools and methods to citizens, both in urban and rural areas. Keeping this us view DU should offer crash programs for technical teams and operators in key economic sectors, as agriculture, manufacturing, trade, construction and services etc).This will broaden scope of stakeholder buy-in and participation through citizen's engagement in such research- oriented exercises, and widen opportunities of citizens' access to research-related benefits.

**(g) Institutional restructuring:**

If required DU Ordinance 1973 could be amended to reflect institutional commitment, compliance and endeavors to broaden research. Each of the academic faculties could have exclusive research zones that could be unified under "DU Research Umbrella".

At the apex could be research superstructure as National Research Advancement Program (NRAP).

Five year Work Plans with Design Operating Monitoring & Output Assessment should be useful.

**(h) Research-supportive domestic environment:**

It is extremely important to ensure professional compliance with requirements of advanced research as well as due diligence in envisioning, undertaking and promoting research within DU. These include conducive environment, consensus, teamwork and stakeholder engagement. Matching resources programs and competencies would bear more effective outcomes through which the country and people will further be benefited.Therefore the vision of Welfare - oriented research could be materialized.

*(Senior Economist, Governance Specialist & Policy Analyst Dr. Mohammed Parvez Imdad, MSS, M, Phil, PhD (Economics) and PhD (Public Administration), BCS worked for several years in Bangladesh Civil Service and in International Multilateral Development Organization) He was recipient of "Chancellor"s Gold Medal of Dhaka University". Dr. Imdad is founder President of Knowledge Forum & Foundation and currently engaged in research, advisory and academic assignments)*

*Congratulations & Greetings From Bangladesh Knowledge Forum & Foundation ( BKFF). We Wish DUAFI Further Success In The Times Ahead.*

**Dr. Mohammed Parvez Imdad**
**Founder President, BKFF**
(On behalf of BKFF Board)

# হাঙেরীর বালাটন জলরাশি তীরে কবিগুরু

রোকেয়া হায়দার

"যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে", কবিগুরুর মনে কখন এই কথা সুরের দোলা জাগিয়েছিল কে জানে তবে বহুবার বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে গানটি শুনেছি আর ভাবনারাশি আমায় নিয়ে গিয়েছে এক অজানা অথৈ জলরাশির মাঝে দূরে কোথাও। বিশ্বকবি তরুণ বয়স থেকেই গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ পেরিয়ে বিদেশ যাত্রা করেছেন, সেই যাত্রার নানা কাহিনী শুনেছি। যুক্তরাজ্য, চীন, জাপান থেকে নিয়ে ইওরোপের কত না দেশ পাড়ি দিয়েছেন - কত অজানাকে অচেনাকে আপন করে নিয়েছেন তার নিজের ভুবনে। আমার মনে দূর সীমানা পেরিয়ে যাওয়ার সাধ বুঝি সেখান থেকেই শুরু।

আমার নিজের কথায় ফিরে আসি - স্কুল জীবনের অনেকখানি সময় কেটেছে কলকাতায়। আব্বা ব্যবসার কাজে দেশ বিদেশ যেতেন, আর আমাদের স্কুলের লম্বা ছুটির সময় আব্বা-আম্মা, সবাইকে নিয়ে কলকাতার বাইরে রাঁচি, পুরী, দার্জিলিং বেড়াতে যাবার এক নিয়মিত রেওয়াজ ছিল। এইভাবে ছেলেবেলা থেকেই আমার দূরন্ত মন নিরন্তর দেশে বিদেশে ছুটে বেড়িয়েছি - কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা - মনে মনে তো বটেই !

জীবনের নানা ঝঞ্ঝা কাটিয়ে কর্মজীবনে এসে দারুণ সুযোগ হাতছানি দিল - সুদুরে চলো। বিমানের পাখায় ভর করে নীল আকাশে ভেসে উড়ে এলাম পদ্মার তীর থেকে পটোম্যাকের তীরে! সংবাদ সংগ্রহ আর সরবরাহের সুবাদে নতুন দেশ দেখা আকর্ষণীয় সব খবরাখবর আমার শ্রোতা দর্শকদের জন্য পরিবেশনের চমৎকার সুযোগ অজানাকে জানার বাসনা পূর্ণ করেছে। নির্ধারিত কাজের মাঝেই খুঁজে ফিরেছি দূর প্রবাসে বাঙালীর কোন বিশেষ পরিচয়, কোন আকর্ষণীয় তথ্য। নতুন দেশ দেখা, সে দেশের মানুষ ভাষা ইতিহাস সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়া সেই অপূর্ব অনুভুতি বর্ণনা করা কঠিন তবে আমার ভ্রমন কাহিনীর মাঝে স্মরণীয় কিছু অধ্যায় আছে যার একটি হলো বাঙালীর গর্বের কথা! পূর্ব ইউরোপীয় দেশ হাঙেরী - "হাঙেরীর সমুদ্র" নামে সুপরিচিত বিশাল হ্রদ - লেক বালাটনের তীরে রবীন্দ্র সরণী - টেগোর প্রোমানেড বিশাল উচ্ছল জলরাশির তীরে নানা ফুলে ফুলে সাজানো উদ্যান, তার মাঝে রয়েছে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত চল্লিশজন গুনী বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শান্তিকামী বিশেষ ব্যক্তির নামাংকিত ফলক আর সেই দর্শনীয় স্থানটিতে রয়েছে ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল জয়ী কবিগুরুর আবক্ষমূর্তি। ১৯২৬ সালে কবির নিজের হাতে লাগানো এক গাছের ছায়ায়। তিনি ওই গাছের চারাটি রোপন করে বলেছিলেন, একদিন সবুজ পাতায় ভরা এই

গাছটি শ্রান্ত পথিককে স্নিগ্ধ ছায়া দেবে! জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাঙেরী ভ্রমনে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন সেই সময় বালাটনের ধারে আরোগ্য নিকেতনে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন।

তাঁর মূর্তির কাছে শ্বেত পাথরের ওপর "শাহজাহান" কবিতার পংতি উজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত, বাংলা এবং হাঙেরীয় ভাষায় --

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায়
কীর্তিরে তোমার বারম্বার"

শিহরণ জাগানো অনুভুতি "কত না দেশের পর্যটকরা দূরদুরান্ত থেকে গিয়ে পরিচিত হন বাংলার রবির সাথে। অনেকেরই হয়তো মনে নেই বা জানা নেই ১৯০১ সালে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তনের পর থেকে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের গুণীজনেরাই এই সম্মান লাভ করেন এবং এশিয়া মহাদেশ থেকে প্রথম নোবেল জয়ী একজন বাঙ্গালী - ১৯১৩ সালে এই সম্মানে ভূষিত হন ভারতের কবি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর!

মধ্য ইউরোপীয় ইতিহাস আমার প্রিয় একটি বিষয়, তাই হাঙেরী এবং অস্ট্রিয়া আমার ভ্রমন তালিকায় বারবার ফিরে আসে। হাঙেরীর রাজধানী সেই নীল জলরাশি Blue Danube যে রাজধানী শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড় আর নদীতে ঘেরা অপূর্ব বুডাপেস্ট শহর থেকে প্রায় দেড় ঘন্টার দূরত্বে একদিন কবি গিয়েছিলেন হাঙেরীর কবিতা প্রেমী মানুষের কাছে, সেই দিনগুলি সেই সময়টি কেমন ছিল জানতে ইচ্ছে করে, তখন তাঁর মনে মনে হয়তো ছিল এই কথাটি

"যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
আমি বাইবো না...
আমি বাইব না মোর খেয়া তরী এই ঘাটে ...
তখন কে বলে যে সেই প্রভাতে নেই আমি..."

শতবর্ষ পেরিয়েও বাঙালীর সকল ভাবনায় মিশে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ!

*(রাকেয়া হায়দার জনপ্রিয় সাংবাদিক, সম্প্রচারিকা, ভাষ্যকার ও সংস্কৃতিসেবী। লেখাপড়া করেছেন ইডেন কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সংবাদ মাধ্যমে তাঁর যাত্রা শুরু হয়ে চট্টগ্রাম বেতারে ১৯৬৯ সালে, তারপর ঢাকা বেতার ও টেলিভিশনে। ১৯৮১ সালে তিনি যোগ দেন ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগে এবং ২০১১ সাল থেকে প্রায় এক দশক তিনি সুনামের সাথে এই বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সপরিবারে ভার্জিনিয়া থাকেন।)*

*(লেখাটি পূর্ব প্রকাশিত)*

# I Miss My Life at Dhaka University

**Shameem R. Selimuddin**

"I thought I could keep my rainbow colored days
trapped in a cage of gold…."
--- *Rabindranath Tagore*

I am writing about my personal experience of my life at Dhaka University. It was a dream come true after graduating from Holy Cross College. There was so much excitement, anxiety, and uncertainty coming from a small women's college. Many of my college friends went to DU, so the transition was not so difficult. It seemed like a place of freedom, coming from a controlled environment. There were four of us from college who always stayed together. Gradually we made many new friends who came from other parts of Bangladesh, and many stayed in Rokeya Hall.

At Rokeya Hall we sat on the grounds by the pond, talked, sang, had tea and snacks. This experience led to lifelong bonding and permanent relationships. Many are now in Bangladesh and many are residing abroad. We still keep in touch through WhattsApp, Zoom, and phone calls. We have a WhattsApp group of DU 1968, where we now communicate regularly. We find out about our fellow batch mates in Bangladesh and in other countries; if they are ill or having a special something to communicate to the group; and they do occasional get togethers when any of us go to Bangladesh. Some of my friends have passed away, due to Covid and other illnesses. I remember them so well, as we did activities as a group.

The Teachers Students Center (TSC) was another spot for gathering, the grounds, cafeteria, bookstore, and cultural functions. We did many cultural programs together in the auditorium. These activities took place after classes or in the evening. Our Sociology Department produced some prominent artists. To name a few: Sakera Ahmed, Rebeka Sultana, Zeenat Aliya Polly, Doreen Zaman, Sabina Yasmeen, and Shabnam Mushtari. I also participated at many programs at TSC with my friends. Some of my friends became DU professors and led their departments as chairperson.

There are so many memories that I remember. One I would like to recount is that we used to have final exams in the first year. I stood first in class, which entitled me to get

a scholarship, allowing me to attend tuition free for the four years that I was there.

My favorite place at Dhaka University was the library. Most of my four years were spent there. I used to be there before, in between, and after classes. The library had a great collection of books, encyclopedias, and books of research. There were no computers or internet to browse for information, so we took notes the old fashioned way. Some of the books could not be checked out, so we had to work inside the library. Sometimes I went there alone, sometimes with friends. It was a quiet place away from the commotion of the Arts Building. We had to walk from the Arts Building to pass Modhur Canteen, on the way to the library, and after that sometimes we rested on the grounds of Rokeya Hall. The walkway was nice, with trees lined up by the beautiful path.

This is where I met my husband, Abu Selimuddin. He was in the Economics department, I was in Sociology. One day, a senior friend of mine, who was his friend too, met me at the library downstairs, where the long research tables were. I was there working on a paper, and my friend came up to me and sat beside me. Selim was sitting opposite me at the table. At that time, I didn't know him. The friend said, "Do you know this guy?" I said "No." My friend said that he wanted to talk to me. I thought that this was not a place to talk, as we could only whisper. The conversations started occasionally, then became more frequent. I got my MA in 1974. Selim got his in 1973. Because of his excellent result, he joined the Economics faculty as a Lecturer, and taught from 1973-1975. We got married in 1975, then he got a scholarship to go abroad for higher studies.

Just after Bongobondhu's assassination in August of 1975, Selim was supposed to leave for Canada. The country was in turmoil and there was uncertainty, so he and some of his friends resigned. They could not wait for leave of absence from the university, because their classes were supposed to start in September. I joined him in Canada in October of 1975, and this was the beginning of a new life outside from home.

Thus started our journey in the United States, with struggles, excitement, and good times. The rest is yet to unfold. However, we did not forget our motherland and our precious DU life. We still go there and visit the University grounds and buildings,

which have changed so much in these five decades that have passed.

The education and the foundation that we received from DU was so valuable in helping us integrate and make a smooth transition to life in another country. We will never forget our alma mater. It is the most carefree, best, and enjoyable part of my life.

Being a Tagore lover and singer, I passed my spare time abroad into thinking about, reading, and singing his songs. Now in my senior retired life, I have made Tagore my life's journey. I always relate his words to the Dhaka University life that I left:

"She is our own, the darling of our hearts,
Our dreams are rocked in her arms."
--- *Rabindranath Tagore*

"I have made you my lodestar;
I shall follow your light.
Never again shall I flounder
in this ocean of life."
---*Rabindranath Tagore*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালুমনি ফোরাম (ডি এম ভি) আয়োজিত প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মিলন মেলায় সবাইকে জানাচ্ছি প্রানঢালা শুভেচ্ছা। আর একই সঙ্গে ড. ইশরাত সুলতানা মিতার নেতৃত্বাধীন নবনির্বাচিত ২০২৫-২০২৬ বোর্ড এর জন্য রইলো শুভকামনা। আমাদের প্রাণ প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শত বছরের। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে ইতিহাসের নানা সন্ধিক্ষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা অপরিসীম। আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে গর্বিত।

**আরিফুর রহমান স্বপন**
**ও**
**সাবরিনা রহমান শর্মী**

# A Real Conversation with Gerard – An Uber Driver February 1, 2020 – Day of Brexit

**Raihan Elahi**

"GRAAIHAAN?"
"Well, it is more like - Raihan."
"RAAIHAAN?"
"You got it."

I am accustomed to these types of opening conversations, mainly because I didn't compromise by switching to a more "user-friendly" name like Tom, Dick, or Harry, as many of my expat friends have. In my view, holding on to my own name exposes it to others and asserts its existence. While people talk about respecting diversity, they often, in the name of fitting in and becoming a member of the inner circle, are too eager to give up their values and principles. Though my neighbors and colleagues find my name difficult, I take the time to make it easy for them, which allows me to start a conversation about my country, culture, values, etc. I consider this extra work my responsibility. If I give up even before trying to make others know that "Raihan" can also be a name of a person, and not everyone should be called "Bill" or "Dick," then calling for the whole world to be respectful of diverse human cultures will die with me changing my name.

Gerard then asked his second question, "Why are you taking Uber to go to the airport instead of taking the train?" I was not prepared for this question. He was kind of asking me why I was paying him twice the cost of taking a train. I dodged the question, "Let me answer you in a while."

He was quite a chatterbox. I should have chosen "no conversation" in the option box when I called the Uber. Without wasting time, he poured out his next round of questions. "Where are you going? Where are you coming from? How long have you stayed here?" As a frequent traveler who always meets strangers on the road, these were common questions I am used to. By now, I have mastered these questions. I don't like to share all my specific travel details with strangers, but at the same time, I don't want to be rude or factually incorrect. So, I responded with an uninteresting tone to make that the end of our conversation as I was at the edge of filling my quota of talking to strangers, "Well, I came to Amsterdam from Africa and now I am going to the States." Then I started to check my emails, hoping that would make him quiet.

Gerard looked at me through the rear-view mirror, “Wow, what a coincidence, I was in Uganda two weeks ago, spent 10 days in a game reserve. Such a peaceful place. They took me to a village, I met with the local people – all of them treated me with respect. It reminded me of the time when I was in Surinam. You know Surinam? A country in South America which was also colonized by us (Dutch). The people there also treated me with lots of respect. They didn’t know who I was. I couldn’t figure out what I did to get their respect, but I could tell that they were putting me at a higher level from where they are – the only reason I could think of is my color of skin. You know, they have been independent for so many years, no longer tied with physical chains, but the way we treated their ancestors, that behavioral pattern has gotten into their genes. It is now the spiritual chains which tie them up and that is why they still think I am better than them and they must treat us with respect and put us on top of them. Makes me wonder.”

“I hope you understand what I am saying because India was also colonized for a long period.” Another common mistake people make with me, and I am very fast to correct them. “I am not from India. I am from Bangladesh.”

“Oh! I see, but you used to be part of India before.” I know this drill – it is following the same pattern of conversation. I emphasized, “No, Bangladesh was not part of India. Bangladesh was part of the Indian Subcontinent, which was under the Mughals when the British colonized the subcontinent. When the British left, they divided the subcontinent into bits and pieces following the famous divide and rule theory and the countries are still fighting each other.”

Gerard realized that he had primed me up for the rest of the half an hour he had till we reached the airport. “You know, we are the masters of that theory – divide and rule. You must have heard about apartheid. That notorious policy was our creation. We played this game of divide and rule so well that it allowed us - a minority fraction of the people, to rule over the majority for a long period. We played with people’s minds and emotions. Set one against the other. Kept them consumed with fighting their neighbors. Segregated the society in terms of race, religion, color of skin, and whatnot. They could never come together and face us. Even before they could realize, we had the upper hand.”

I found the direction of the discussion stimulating, mostly because it was happening on February 1, 2020, the day Brexit came into effect, with a person whose ancestors devised apartheid and having this conversation in his own country. To make the discussion interesting, I asked, “But you are one of them. Your ancestors were the colonial powers and benefitted from apartheid – how could you talk about that so calmly and without being biased towards your own people?”

I will never forget his answer. “You know RAAIHAAN, when I was 12 years old, I went to a friend’s house who was Black. In the evening, his mother called us to have dinner and gave a plate in front of me. I felt uneasy as I was not scheduled to have dinner at their house. There was no hesitation among them, everything was normal, they were all serving food on their plates, but I was sitting quietly. My friend’s mother asked, - Gerard, why are you not taking any food? Are you not hungry? I said, I am supposed to have food at home. My mom has cooked for me. She said, so what? Aren’t you hungry? We are having food now, have food with us. That was the end of the discussion. I had food with them. After several days, I had that friend come over to my house. At 6:00 pm, my mother told me, “Gerard, it is 6:00 pm, time to have your dinner.” And she gave only one plate on the table – for me. I requested my mother for another plate for my friend. My mom said, “I did not schedule dinner for him at our house. Besides, his mother has cooked food for him. He should have food at his place, he should not waste that food.” I could not fight my mother. I lost that battle. I told my friend that he should go home as it was dinner time. Then I sat to have dinner with my mom and told my mom, “I don’t want to be like you.” At that time, I did not know much. I thought it was the difference between White and Black culture. But as I grew, I realized it was not Black culture – it was non-western culture. Non-western culture is inclusive, it opens doors to everyone. You give a dinner plate for all those who are at your home. You don’t send people away from your home just because it is dinner time, and you haven’t scheduled dinner for them. I found similar cultural practices as I traveled to Africa and Turkey and am sure to find much more of similar culture if I travel further east – India and beyond.”

“Our western culture trains us to decide with our brain - with logic. Not with our heart - with feelings. Deciding logically is secure, safe. Over the years, we got so tuned with it, that we are unable to accept those who decide with heart. We feel insecure around them and then we want to defeat them as a society as they are not like us. We establish ourselves as superiors compared to them and make them feel inferior – in the society. This is what allowed us to colonize all those who were living their lives with their hearts. We overpowered them with our logical decisiveness. We are now paying the price of what our ancestors did. What I see happening all over the world is the price that we need to pay for what we did for centuries.”

I didn’t understand the last twist in his sentence. So, I requested Gerard to explain what he meant. Gerard continued, “Look at Brexit. It is happening today – and they can afford to do it. They are an island and have an island mentality. They can exclude themselves from others because they are separate from the rest. But we cannot do the same. We cannot say that we don’t trust the immigrants who are knocking on our

doors today. In the past, we went to their countries, colonized them, oppressed them, and benefitted from their wealth for centuries. We cannot just give a blind eye to them now. They also have a share of the wealth we are enjoying today. We must open our doors to them - it is us who created this difference in wealth between us and them."

Gerard was entering the airport, realizing his time to share his views with me was coming to an end, he paused and asked, "What do you think?"

I said, "Gerard, I think you have deep thoughts – and I agree with you." And one other thing Gerard, "You asked me, why I took Uber and not the train? It's because I had to meet you and have this wonderful exchange of views." The car was at the departure terminal. He came out of his car – for the first time I saw his face – so far it was only his forehead and eyes through the rear-view mirror. He was a white guy, about 6.5 feet tall with blond hair. He held my hands and bade farewell. I felt I was leaving a friend behind – he said, "My skin is white, but I am more like you!"

*ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলুমনাই ফোরাম এর দ্বিবার্ষিক মিলন মেলায় সকলের জন্য রইলো প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা। মিলন মেলায় মনের আনন্দে ছন্দে ও সুরে আমরা ফিরে যাই সেই ফেলে আসা দিনগুলোতে, মেতে উঠি মনের আনন্দে। এরকমই একটা দিন কাটাবার সুযোগ আজ ডুয়াফি প্রেসিডেন্ট ড. কাইয়ুম খানের নেতৃত্বে আমরা উপভোগ করব। অনুষ্ঠানের পূর্ণ স্বার্থকতা প্রত্যাশা করি। সাথে সাথে আগামীর ডুয়াফি প্রেসিডেন্ট ড. ইশরাত সুলতানা মিতার নেতৃত্বে নতুন বোর্ড এর প্রতি থাকল আন্তরিক অভিনন্দন।*

**রায়হান এলাহী ও অদিতি সাদিয়া রহমান**

# স্বপ্নভূক

আহসান জামান

ঃ আরিফ, আরিফ।

ঃ উঁ, শুয়ে শুয়ে উত্তর দেয় আরিফ।

ঃ ওঠো; ক্লাশের সময় হয়ে যাচ্ছে যে। রান্নাঘর থেকে মা চিৎকার করে বলেন।

চোখ খুললো আরিফ। জানালায় ফালি ফালি রোদ এসে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে তার বিছানা। অনেক বেলা হয়েছে এমন একটা আশঙ্খা তার মনে ভীড় করে। বালিশের পাশে রাখা হাত ঘড়িতে চোখ রাখতেই ছানাবড়া; ছ'টা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। অবশ্য তাড়াতাড়ি করলে ভার্সিটির বাসটা ধরা যাবে। এমন সুন্দর ঘুমঘোর কাটিয়ে উঠতে তার মনের ভিতর খচ খচ করে। আহা! তার সুন্দর স্বপ্নটাতো ভেস্তে গেলো, ভাবতেই তার মনটা খারাপ হয়ে গেলো আবার। কি যেনো কী, খুব একটা মনে করতে পারছে না, কেবলই ছিন্ন ভিন্ন কিছু দৃশ্য মনে পড়ছে তার। স্বপ্নগুলো এমনই হয়; কিছুতে আর জোড়া দেওয়া যায় না। দূর ছাই, মনটা আবার খারাপ হয়ে গেলো তার। ঠিক সেই সময় দরজায় টোকা পড়ল আবার। তার মানে আর একটু পরে দরজা খুলে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে মা অথবা ছোট বোন; আর শুরু হবে রোজকার মতো হাকডাক, গজর গজর ইত্যাদি ইত্যাদি। অসহ্য, বিছানায় থাকাটা তার জন্য আর সুবিধার নয়, উঠে বসলো সে। আবারও ঘড়ি দেখে নেয় সে। হুম, এবার ঘুম একেবারে চলেই গেলো। রাত জেগে পড়াশুনা করার এই একটা দোষ; সকালে ঘুম ভাঙে না। ভার্সিটির তিন পুরুষ উদ্ধার করতে করতে বাথরুমে ঢোকে; ক্ষণিকে সে ক্রোধ ধুঁয়ে মুছে যায়।

আরিফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স করছে, ফিজিঙে। এবার থার্ড ইয়ারে। পড়াশুনার চাপ একটু বেশী; প্রত্যেকটা ক্লাশই খুব মন দিয়ে দিয়ে করতে হয়। আরিফ পড়াশুনায় মনোযোগী, অন্য দু'বছরের যা রেজাল্ট তাতে আর একটু খাটলে হয়ত ফার্ষ্ট ক্লাসটা হতে পারে। তাই ইচ্ছের জবরদস্তিটা তার প্রখর। সকাল আটটা থেকে ক্লাস। এই মীরপুর থেকে প্রতিদিন সাতটা দশের বাস ধরলেই ব্যাস, আটটার আগেই পৌছে যায় কার্জন হলের গেটে। আর বাসটা মিস করলেই যত ঝামেলা। আজকাল লোকাল বাসে যা অবস্থা! আরিফ ভাবতেই উপ্স করে উঠে; লোকজন ঠেলে, কন্ট্রাক্টরের একটানা বকবকানি শুনলে পড়াশুনার ধৈর্য্য আর স্পৃহা একেবারে দৌঁড়ে পালায় আরকি। তাই তার এতো ব্যস্ততা আর সাবধানতা। মাঝে মাঝে এমনটি যে হয় না, তা নয়। তবে এ বাসে যাওয়াটার ভিতর আলাদা একটা মজা; খুব আপন পরিবেশে সাচ্ছন্দ্যে যাওয়া যায়, এই যা।

বাথরুম থেকে বের হয়ে আবারো ঘড়ি দেখে সে; বেশতো অল্পসময়ে সে সবকিছু সেরে ফেলেছে। এবার আর কি; ড্রেস পরা, চট করে সেরে নেয় সে। কেমন লাগছে জিজ্ঞাসিত চোখে দাঁড়ায় আয়নার সামনে, বেশতো। চুলে চিরুণী, হাতে মুখে হাল্কা লোশন; আর কি বাকী? ভাবতে ভাবতেই আরিফের মন হু হু করে ওঠে; আজকাল বন্ধুদের আড্ডাতেও তার মন বসে না। মনে হয় সবকিছু কেমন দূর হয়ে যাচ্ছে তার। অসহ্য শূন্যতা তাকে গিলে অবিরত; সবার মাঝে থেকেও সে কেমন একা হয়ে যাচ্ছে। অতীতে ডুব দেয়, তুলে আনে এক একটা দিন - স্মৃতির দর্পণে। ভেসে ওঠে শৈশব ... কৈশোর ... পারা, না-পারা ... বাবা-মার ঝগড়া, সংসারের নাজুকতার ক্রোধ ছেড়ে সে আরো তলিয়ে তুলে আনে আরো নিজস্ব কিছু ... তার ব্যর্থতা ... ভাবতেই যেন হাত ফসকে পড়ে যায় তার ... বুকের ভিতর ঝড়ো ধাক্কায় ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে সে। মুক্তি চায় সে, চায় অবসান। দৌড়ে পালায় সে স্বপ্নরাজ্যে। কী আর করার যুদ্ধ। স্বপ্ন আর বাস্তবের বিস্তর ভেদ। এভাবেই তার মনে গড়ে উঠে বিস্তর পাথর; পড়ে থাকে এই আপোষ-আপোষ খেলায়।

আরিফ এবার চোখ রাখে টেবিলে, গতরাতে গোছানো বই-খাতা ব্যাগে ভরে, জুতা পড়ে নেয় চট করে। এবার নাস্তা সেরেই ছুটে যাবে সে ডিপার্টমেন্টে। ডিপার্টমেন্ট মানে তার কিছু ভালো লাগা মুখের কাছে, বন্ধুদের কাছে আর পড়াশুনার তলদেশে কিছুক্ষণ - তার মাঝে খুঁজে পাবে সে রিলিফ তার এই বিষণ্নতা আর একাকীত্ব থেকে। গোছগাছ শেষ হতে হতেই ওদিকে ডাক পড়ে মার।

ঃ নাস্তা রেডী।

ঃ আসছি, মা। বলতে বলতে খাওয়ার টেবিলে যায় আরিফ। নাস্তা সেরে ব্রাশ করে নেয়, এবার সে রেডী টু গো। ব্যাগ হাতে নিয়ে মেইন গেট খুলে বের হতে হতে বলে।

ঃ আসি, মা।

ঃ তাড়াতাড়ি আসিস বাবা।

ঃ ফিরতে সন্ধ্যা হবে, প্রাকটিক্যাল আছে।

রাস্তায় ভিড় বাড়ছে, লোকজন চলাচল চারিদিকে - কেউ দ্রুত হাঁটছে, কেউ অলসভাবে, যেনো অকারণে রাস্তায় নেমেছে তারা। গত দু'দিনের মেঘলা আকাশে আজ রোদ সকাল, বড্ড উপভোগ্য, খুব সুন্দর লাগছে তার হাটতে - মনটা তার প্রফুল্লতায় ভরে উঠে। হাটতে হাটতে পৌঁছে গেছে বাস স্টপে। সিগারেটে আগুন জ্বালায়, চেনাজানা জায়গাটা সে আবারও দেখে নেয় - অপেক্ষার মন-চোখ খুবই অধীর। বাসে বেশ ভীড় হয়। বিশেষ করে এই স্টপে বেশ ক'জন থাকে। কখনও ভাগ্যে থাকলে সিট খালি পায়, তবে তাতে আরিফের মাথা ব্যথা নেই। আরিফ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে অসাবধানতায় ডান পাশে তাকায়, ইতিমধ্যে অনেকেই এসে গেছে। কারো হাতে বই-খাতা, কাঁধে ব্যাগ কারো। কেউ সতেজ, কারো মুখ উসকো-খুসকো। হয়ত কারো আজ পরীক্ষা আছে, কেউবা এসে জুড়ে দিয়েছে খেলার গল্প। এ যাত্রী-ছাউনীতে বেশ কিছু অফিসের বাস থামে, তাই এই ভীড়। তাদের আলাপ সংসারের ধারাবাহিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আপনার ছেলের রেজাল্ট কি ... বাজারের যা অবস্থা ... মেয়ের বায়না শিশু পার্কে যাবে ... আজ অফিস থেকে একটু আগেই বের হতে হবে ... ছোট ভাইয়ের অসুখটা তেমন কোনো চিকিৎসা ... তেমন কোনো ছেলের সন্ধান পেলেন ... রাজনীতিতো বেশ জটিল ... এইরকম হাজার হেডলাইনে আবদ্ধ তাদের আলাপন কিন্তু ছাত্রদের চিৎকারে ঢাকা পড়ে যায় মুহূর্তেই। কিরে কেমন কাটাচ্ছিস ... বেশ তো ... নারে পরীক্ষার চাপ ... এবারও পিছাবেরে ... চিন্তা করিসনা ... মধুতে যাবো ... দেখা হবে ...।

আরিফের হাতের সিগারেটটা তখনও শেষ হয়নি; এই আলাপ উপচে অহেতুক তার মন উড়ে যায় আর একটু দূরে। নীল পোষাকে মেয়েটি, হাতে লাইব্রেরীর দু'টো বই। আরিফ মনে মনে হেসে ফেলে। বাপরে! কী পড়ুয়া তুমি, বলেই নিজকে ধমক দেয় আরিফ। কী সুন্দর তার চোখ, অসম্ভব মায়াময়, স্থির ধীরতা, লম্বা চুলে যত্নচিরুণী বুলানো। পরনে নীল, অপূর্ব দেহ গড়ন; যেনো ফিক করে হেসে ওঠে সকালের আকাশ।

দিনটি আরিফের কাছে আরো রৌদ্রোজ্জ্বল মনে হয় মুহূর্তেই। চোখ বুলিয়ে পড়ে নিলো সে, ইকনমিক্সের ছাত্রী। চোখের পলক পড়ল তার, অপূর্ব! কি নাম আপনার? চৈতী; বলেই কুচি কুচি হাসির রেখা আঁকে মুখে। আপনার? আমি আরিফ, ফিজিঙে থার্ড ইয়ার। কোথায় থাকেন, মানে কোন ব্লকে। এইতো এ-ব্লকে, সাত নম্বর বাড়ী, দু'নম্বর এ্যভিনুয়ে। তুমি? খুব কাছাকাছি, তিন নম্বর রোডের বাইশ নম্বর বাড়ী। অথচ কী দূরত্ব, তাই না! বলেই আরিফ ঠোঁট কামড়ায়। চৈতী হেসেই লুটোপটি। তারপর আচমকা বেজে ওঠে - একদিন আসেন না বাসায়, গলায় অসম্ভব মায়ার মিনতী। ঠিকানা মনে আছেতো? বজ্রাহত আরিফ যন্ত্রের মতো বলে ওঠে হ্যা, আছে। আপনার চোখের পাতা কাঁপছে; দেখেন, সুখবর আসবে- বলেই তার সারা মুখে হাসির দোলা। তুমি এতো সুন্দর হাসতে পারো। লজ্জা যেনো হঠাৎ ছুঁয়ে গেলো তার মুখে। আরিফ কৌতুহলী দু'চোখে শিশুর মতো থাকিয়ে থাকে। কী দেখছেন? তোমাকে। যাহ চৈতী হেসে ফেলল আরাব। কিন্তু সে হাসি হারালো কোন গভীর বিষণ্নতায়; আরিফ বোঝেনা, কেবল তার কম্পিত দু'ঠোটে নিঃশব্দে নেচে যায় আনমনে। গলায় গাঢ় মায়া উপচে চৈতী বলে, কী বলছেন ঠোঁটের ফাকে? কই কিছু নাতো। না, না বিড়বিড় করে

কী যেনো বলছেন; একেবারে তদন্তচোখে তাকিয়ে বলে, ও বুঝেছি ... কবিতা হচ্ছে; তাই না। না, মানে ... আপনিতো কবিতা লেখেন, আমি জানি। কোনো দ্বিধা বা জড়তা ছাড়াই চৈতী বলল। ধরাপড়া সুবোধ ছেলের মতো আরিফ বোকাস্বরে বলল, এইতো মাঝে মাঝে ... একটা বলুন না, প্লীজ। এবার জড়তা ঝেড়ে সে বলল দুর বোকা, কবিতা কী যখন তখন হয়! একি আর ফিজিক্সের থিওরী যে হরগর করে বলে গেলাম যখন যেমন। অসম্ভব জিজ্ঞাসু তৃষ্ণার্থ গলায় বেজে ওঠে, কবিতা কখন হয়, আরিফ ভাই। এ প্রশ্নের উত্তর যেনো আরিফেরও জানা নেই। সে তাই একই প্রশ্নের আবর্তে ঘুরতে থাকে আর খুঁজতে থাকে - সে জানে না, কিছুই জানে না ... দ্বিধা, জড়তা আর স্বপ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকে সে। বেশ বিরতি নিয়ে চোখের পলক পড়ে দু'জনার। নীরবতার বাঁধ খুলে আরিফই বলে এগারোটায় ক্লাশ নেই আজ। কোথায় থাকেন তখন? ডিপার্টমেন্টের সামনে, বড় গাছের নীচে। নিশ্চয় বন্ধুদের আড্ডায়। মাঝে মাঝে ভীষণ একা থাকি। কেনো? জানি না; আসবে আজ? আমার তো ক্লাশ আছে তখন। সরি, না, না আসতেও পারি। অপেক্ষায় থাকবো।

আরিফ গাছটার নীচে বসেই ছিলো, রিক্স থেকে নামলো চৈতী। হেসে স্বাগত জানালো আরিফ, বলল একি চলে এলে যে! ইচ্ছে হলো না ক্লাশে বসতে, তাই চলে এলাম। বস ... না, না, এখানে না ... কোথায়? চল, অন্য কোথাও। দু'জনে হেঁটে হেঁটে যতদূর যাওয়া যায় ... চলো ... আজকের দিনটা খুব চমৎকার, না?... হু ... কী ব্যাপার বলোতো ... এতোটুকু উত্তর। আরিফ আচমকা বলে ওঠে, কবিতাতো খুব সংক্ষিপ্ত ভাষা, তাই না? তা ঠিক ... অথচ কি বিশদ গল্পের খসড়া। কি হলো হাসছো যে। আমাকেও কি কবি বানাবে? না, না চৈতী; তুমি আমার ... কী? না মানে ... কী ... কবিতা। চৈতীর প্রশ্নকাতরচোখ দপ করে নিভে যায়; লাজ আর আকুতিকম্পিত স্পন্দনে ভরে ওঠে তারমুখ। সে এক অন্যস্বর বেজে ওঠে, অনেকদূর চলে এলাম দু'জনে। আরিফ তার দু'চোখ থেকে আবিষ্কারের প্রলেপটা তুলে নিয়ে খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, কই ... এতো টি.এস.সি ... সবুজমাঠ ... মিলন স্কয়ার ... আর একটু দূরে তোমার ডিপার্টমেন্ট ... বলতে বলতে গলা কেঁপে যায় তার। সংকোচের বারান্দা থেকে সরে চৈতী যেনো খুব স্বাভাবিক হয়ে ওঠে হঠাৎ; তারপর বলে, চলো চা খাই কোথাও। ঠিক বলেছো, চায়ের তৃষ্ণা পেয়েছে ভীষণ, এইখানে বসি। দু'জনে বসলো। শিশুর মতো হেসে উঠে চৈতী বলল, দেখো, দেখো ... শুরু হয় সেই হাসি। আরিফ সেদিক থেকে চোখ তুলে চৈতীতে রাখে। চৈতী স্তব্ধ হয়ে যায়, স্তিমিত হয়ে যায়। এবার আরিফ হেসে বলে, কই হাসি থামালে যে, বলতেই চৈতী আবার হাসিতে ফেটে পড়ে। খুব সুন্দর, না? বড্ড উদাস গলায় আরিফ বলে, হ্যা। তখনও হাসির কল্লোল, আরিফ আগ্রহী কণ্ঠে বলে, চৈতী, তুমি সারাক্ষণ এতো হাসিখুশী থাকো কী করে? ... তো তোমার মতো গোমড়ামুখে থাকবো? যেনো উত্তরটা মুখেই বাঁধা ছিলো তার ... না, না তাই কি বলছি! জানো, আমি পারি না। দপ করে নিভে যায় চৈতী; আদরমিশ্রতকণ্ঠে বলে, কেনো? ... কী জানি, সবসময় বড় একা লাগে আমার, মনে হয় একটা হাখোলা একাকীত্ব আমাকে গিলে খাচ্ছে সারাক্ষণ। দুর ছাই, এইতো আমি, আরিফ। চৈতী বলে, চারিপাশে এই চিৎকার, হাসি-ঠাট্টা, আনন্দ-উল্লাস, দুঃখ-বেদনা আর এই, এই আমরা দু'জন। আরিফ যেনো না থেমে বলে চলে, আর কই ভয়! ... এই আমি আঙ্গুল বুলিয়ে দিচ্ছি চুলে-চোখে-মুখে। এখানে বড্ড ভীড়, চলো দূরে কোথাও! ... কোথায়, আরিফ! ... অনেকদূরে ... এইসব চারপাশ ছাড়িয়ে ... না ছোঁয়া মেঘের দেশে ... অন্য কোথাও ...

দু'জনেই আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। ছেলেমেয়েরা প্রতিদিনের মতো দ্রুত হাঁটছে, সে দ্রুততা তাদেরও দোলা দেয়, হাতে পুড়ে যাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে আরিফও আরো জোরে হাঁটে। সামনের দরজায় মেয়েরা, পিছনের দরজায় ছেলেরা বানরঝোলা। নীলপোষাকে সুন্দরী মেয়েটা কোথায় হারিয়ে গেছে সে জানে না কেবল পিছন দরজায় পাদানীতে পা রাখার জায়গা খোঁজে আরিফ; একটু ঠাই হলেই সে খুশী, আর কিছুই জানে না, চেনে না। বাস হর্ণ দেয়, চাকা ঘোরে, পাদানীতে পা রেখেই সে ঝুলে পড়ে আর মনে মনে গালি দেয়, শালা আজ বাসে এতো ভীড়!

# ‘গিভ-ব্যাক’ করতে হবে আমাদেরই

**শাহিদ মোবাশ্বের**

উন্নত বিশ্বে সামাজিক দায়বদ্ধতার (social responsibility) চর্চা বহু পুরানো। তবে বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কতিপয় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে এই চর্চা কিছুটা চোখে পড়লেও ব্যাপক আকারে তা তেমন দৃশ্যমান নয়। পাশ্চাত্যের দেশগুলোর প্রায় সকল কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা চর্চার পাশাপাশি ব্যাক্তি পর্যায়ে 'গিভ-ব্যাক' (give back) বা 'ফিরিয়ে দেয়া' নামক নৈতিক দায়বদ্ধতার চর্চা নিত্য চালু রয়েছে। অর্থাৎ সমাজের প্রায় সকলেই মনে করেন কেউ কিছু দিলে তা নগদ বা অন্য কোন উপায়ে ফিরিয়ে দিতে হবে যা 'গিভ-ব্যাক' নামে পরিচিত। উন্নত বিশ্বের প্রায় সকলেই তাদের সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতি নৈতিকভাবে দায়বদ্ধতাকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছে, আর তা ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক যে কোন পর্যায়ে হোক না কেন। পাশ্চাত্যের সমাজে 'গিভ-ব্যাক' যেন এই দায়বদ্ধতায় নিত্যদিনের চর্চার একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানকার সমাজ ব্যবস্থায় এই দায়বদ্ধতার চর্চা সমাজ আর রাষ্ট্রের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালী কাঠামো গঠনেও ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। ব্যাক্তি পর্যায়ে নৈতিক দায়বদ্ধতার চর্চা হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড, এমআইটি, প্রিন্সটনসহ পৃথিবী বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানোন্নয়নেও ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইরা নগদ অনুদান, ফ্যাসিলিটি আপগ্রেড, বৃত্তি প্রদান, গবেষণায় অর্থায়ন, মেনটরশিপ প্রদান, অভিজ্ঞতা বিনিময়, একাডেমিক প্রোগ্রামগুলির মানোন্নয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছেন।

অ্যালামনাইগণ বর্তমান শিক্ষার্থীদের মূল্যবান পেশাদার নেটওয়ার্ক এবং বাস্তব জগতের সাথে সংযুক্ত করে নিজেদের মধ্যে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ার অনুভূতিকে উৎসাহিত করেন। প্রাক্তন অভিজ্ঞ অ্যালামনাইদের অন্তর্দৃষ্টির দিক নির্দেশনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি করে এবং ভবিষ্যত শিক্ষার্থীদের উন্নতির শীর্ষের প্রতি আকৃষ্ট করে।

এও স্বীকৃত সত্য যে, প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের অবদান বর্তমান শিক্ষার্থীদের মেধা আর মননের বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের সম্পর্ক দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা প্রদান করে। প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাদের দীর্ঘদিনের দিনের কর্পোরেট জ্ঞান ও নেটওয়ার্ক প্রদানের পাশাপাশি শিল্পায়নের প্রবণতা, প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট, শিক্ষা প্রদানের কৌশল, বাজার মার্কেটিংয়ের অভিজ্ঞতা ইত্যাদির জ্ঞান বর্তমান ছাত্রদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারেন। এছাড়াও প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা ক্যারিয়ারের পরামর্শ, আন্তর্জাতিক গবেষণা এবং জ্ঞান স্থানান্তরের উপায় এবং পারস্পরিক অন্যদের খ্যাতিও বৃদ্ধি করতে পারে। সর্বোপরি নৈতিকতার দায়িত্ববোধ থেকে অ্যালামনাইরা নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক কিছুই করতে পারে।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শতাধিক বছরে লাখ লাখ শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবন শেষে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েন। তাদের অনেকেই সর্বোচ্চ শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান আর ব্যাপক আর্থিক স্বচ্ছলতায় পৌঁছে

যান। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এসব অ্যালামনাইদের অনেকে অবসর জীবনের অনেকটা সময় দেশেই অবকাশ যাপন করেন। সেক্ষেত্রে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ব-স্ব বিভাগে গিয়ে বর্তমান শিক্ষার্থীদের সাথে নিজ নিজ জীবনের অর্জিত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার বিনিময় ও দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন।

কেউ কেউ আবার সারা জীবনের অর্জিত বিপুল সম্পদের কোন সুরাহা না করে ইহলোক ত্যাগ করেন। উন্নত তথা পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রীয় আইনে কোন ওয়ারিশের দাবী না থাকালে রাষ্ট্রই ঐ সম্পদের মালিক বনে যায়! সেক্ষেত্রে তারা চাইলেই নৈতিকতার দায়বদ্ধতায় 'গিভ-ব্যাক' চর্চার অংশ হিসেবে নিজেদের সম্পদের আংশিক বিশ্ববিদ্যালয় বা নিজ নিজ বিভাগের উন্নয়ন ও কল্যানমূলক কার্যক্রমে দান করতে পারেন।

একজন বিশ্ব মানের মানুষ হতে শিখিয়েছে আমাদের প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় বিনামূল্যে অধ্যয়ন করে আমারা অনেকেই আজ সাফল্যের উর্ধ্বে উঠেছি। আর তাই নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ঋণী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। এবার আমাদের পালা - ফিরিয়ে দিতে হবে আমাদের সেই ঋণ। শুধু সরকারের উপর ভরসা না করে আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য অ্যালামনাই এই বৃহত্তর ওয়াশিংটন ডিসিতেই বসবাস করেন। নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়নে উদ্যোগ নিতে হবে আমাদেরই। আসুন আমরা সবাই নৈতিকতার দায়িত্ববোধ থেকে আমাদের প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গিভ-ব্যাক' করতে এগিয়ে আসি!

*বিশ্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান আরো উন্নত হউক।*
*রি-ইউনিয়নের এই উৎসব মুখর দিনে ডুয়াফির সকল সদস্য এবং পরিবারবর্গের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।*

**-রেহানা কুদ্দুছ শিখা**

# Nuclear Warfare and Global Harmony

**Dr. Andrew Jewel Gomes**

When war breaks out, boundaries change,
And all who die are a token
Of the rage that must run its course
Before words of peace are spoken. ***– Tom Zart***

As human beings, we have the instinct to fight for survival. Throughout evolution and human history, this instinct has been a reliable means of achieving status and a sense of belonging. According to Mike Martin, it is also a proven path to increased reproduction [1]. Over time, with education and social development, additional factors—such as pride, ego, selfishness, jealousy, and greed—have come into play, yet the fundamental drive to fight remains unchanged.

If we look back at the history of wars worldwide, we see that the initiation of each war involves the desperation of a person, group, or nation to achieve a predetermined status or gain possession. Encyclopedia Britannica lists many wars, from the Trojan War and Punic Wars to the Crusades, Wars of the Roses, French Revolution, World War I, World War II, and more. In World War II, we witnessed the first use of nuclear bombs, commonly known as atomic bombs. The destructive capacity and post-radioactive impact on biological systems were massive and unimaginable! The two-day nuclear bombardment of Hiroshima and Nagasaki in Japan resulted in hundreds of thousands of immediate deaths and caused unprecedented devastation in the history of warfare.

Despite humanitarian efforts and appeals from world leaders to halt the production and detonation of nuclear devices, people's shrewdness has continued to find ways to build or use such devices differently, often impacting only the immediate area of detonation. One such example is the dirty bomb.

Let us first discuss how a nuclear bomb works. An atom consists of a nucleus surrounded by electrons. The nucleus itself contains protons and neutrons. The stability of the nucleus can be disrupted by adding a subatomic particle, such as a

neutron. Nuclear energy can be released from an atom in two primary ways: nuclear fission, where a nucleus splits into two smaller fragments along with a neutron, and nuclear fusion, where two smaller atoms are combined to form a larger one. Figure 1 below illustrates the difference between these two processes [2].

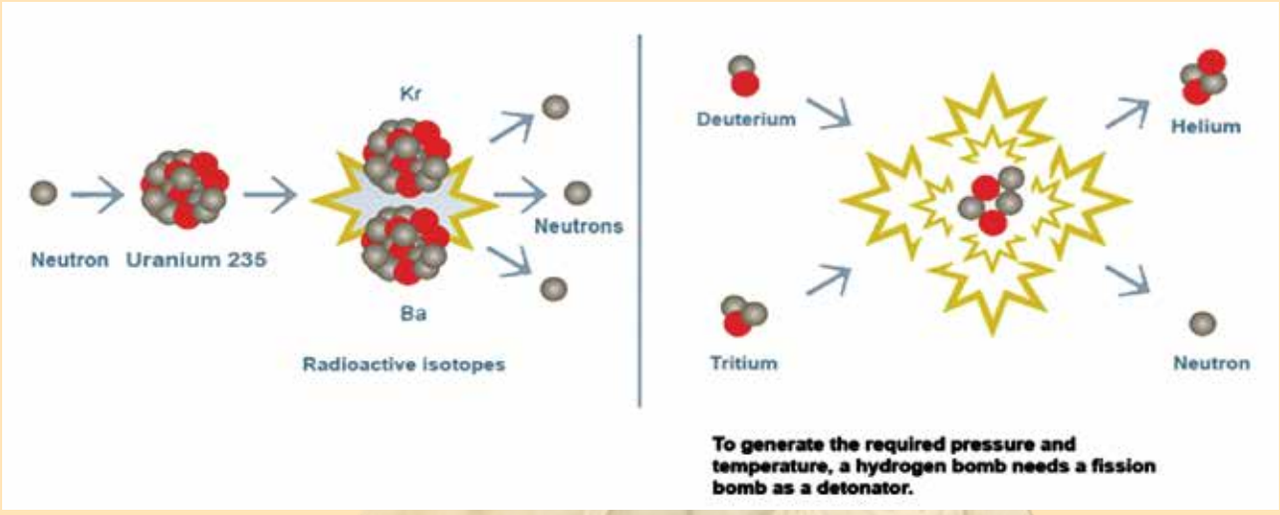


*Figure 1: Nuclear Fission (left) and Nuclear Fusion (right, [2])*

The nuclear fission reaction was used in the bombings during World War II. Nuclear fusion technology, also known as hydrogen bombs, involves a fusion reaction powered by an initial fission reaction. Nuclear experts state that hydrogen bombs are 1,000 times more powerful than conventional nuclear bombs [3]. Currently, nine countries possess nuclear warheads, and their current inventories are shown in Figure 2 [4].

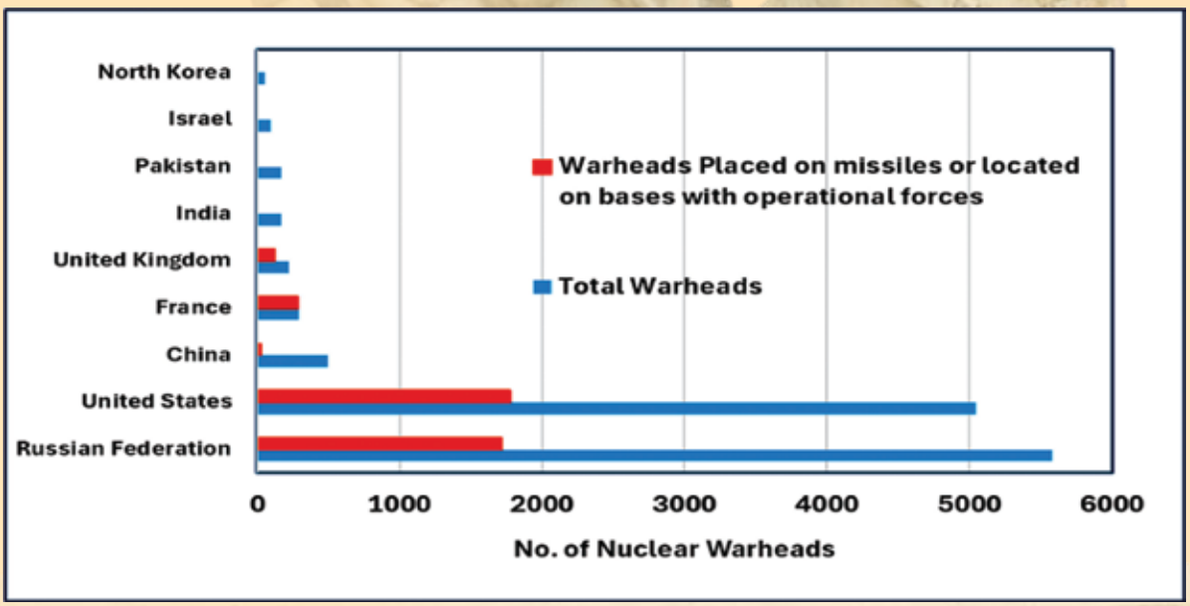


*Figure 2: Possession of Nuclear Warheads (updated until 2024)*

When a nuclear device explodes, it produces a large fireball. Everything inside of this fireball vaporizes and creates the mushroom cloud. In the mushroom cloud, radioactive materials from the nuclear reactions mix with the vaporized materials. As the vaporized radioactive materials cool, it forms condensed particles. These particles can be carried long distances on wind currents and end up miles from the site of the explosion. They can contaminate anything on which they fall, for example, land, food, and water [5].

Dirty bombs are new innovative products from the alternate perspective of nuclear warheads. It is also known as radiological dispersal device (RDD). It combines a conventional explosive (such as dynamite) with radioactive material. When the dynamite or other explosives detonates, the blast carries radioactive material into the surrounding area. The main danger from a dirty bomb is from the explosion, which can cause serious injuries, property damage, fear, panic and costly cleanup. The radioactive materials used in a dirty bomb would probably not create enough radiation exposure to cause immediate serious illness, except to those people who are very close to the blast site. Figure 3 shows a picture of dirty bombs [6]. Rumors suggest that dirty bombs have been used or considered in the ongoing Ukraine-Russia war, and they may see increased use in future conflicts beyond mere testing.

***Figure 3: Dirty Bomb (left, [6]) and Tactical Nuclear Weapon (right, [7])***

Another type of nuclear weapon with low yield and quick deployment capabilities is the tactical nuclear weapon. These are designed specifically for battlefield use rather than for long-range targets like cities or major infrastructure, which are typically targeted by strategic nuclear weapons. Although tactical nuclear weapons generally

have lower yields than their strategic counterparts, they still produce powerful destructive effects, including intense radiation, blast waves, and extreme heat [7].

Belgium, Germany, Italy, the Netherlands, and Turkey host U.S. nuclear weapons, which remain under U.S. operational control, enhancing U.S. nuclear planning capabilities. In 2023, Belarusian President Lukashenko announced that Belarus had begun receiving Russian tactical nuclear weapons [8]. Twenty-eight other nations, along with these six hosts, "endorse" nuclear weapons by allowing for their potential use in their defense through alliances like NATO (North Atlantic Treaty Organization) and CSTO (Collective Security Treaty Organization). These countries include Albania, Armenia, Australia, Bulgaria, Canada, Croatia, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Iceland, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, and Sweden.

According to the CDC (Centers for Disease Control and Prevention), immediate actions to take in the event of nuclear weapon blast or dirty bomb explosion include: get inside, stay inside and stay tuned [9]. U.S. Marine Corps and CDC recommend the following preparation steps, tips, and immediate actions for nuclear safety [10,11]:

**Preparation Steps:**

- Identify nearby shelters (like basements or tunnels).
- Create evacuation and family communication plans.
- Build an emergency kit with supplies for up to two weeks in heightened threat situations.

**Key Protection Tips:**

- Distance: Maximize space between you and fallout.
- Shielding: Use dense materials for protection.
- Time: Limit exposure duration.

Potential Targets: Military bases, missile sites, government centers, major ports, airfields, industrial hubs, and power plants.

**After a Nuclear Blast**

Fallout is most dangerous within the first 24 hours. Shelter for several days or longer if in a high-radiation area. If outside, clean wounds, cover nose and mouth, and use only stored food and water.

**Immediate Actions for Nuclear Safety**

**If Outside:**

- Cover nose and mouth with a cloth to minimize inhaling radioactive dust.
- Avoid touching debris, as it may be radioactive.

- Move quickly to a building with intact walls and windows for shielding.
- Once inside, remove and seal outer clothing in a plastic bag along with the cloth used to cover mouth—this removes up to 90% of radioactive dust.
- Store the sealed bag away from others, shower thoroughly with soap, wash hair, and tune in to local radio or TV for updates.

**If Inside:**

- Remain indoors if the building is undamaged; close all windows, doors, and dampers to prevent dust from entering, and turn off fans and HVAC systems that pull in outside air.
- If there is structural damage, move to an interior room or, if heavily damaged, find another building with intact walls.
- If need to go outside, cover nose and mouth and follow the same procedures as mentioned above for outside.

There is no question that nuclear weapons and RDDs have the capacity for unparalleled destruction and catastrophic humanitarian consequences. Their devastation is so overwhelming that no state or organization can respond adequately. The most effective way to eliminate these risks is to eliminate these weapons themselves. The world awaits our active role, and our voices raised against war. Let us broadcast our choice for peace through local, state, and global representatives. Let us shout, “No war, but peace.” As President Kennedy said, "Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind." Let us echo this sentiment through our actions and advocacy. May the dove of peace fly over our beloved green earth with this vivid message.

**Acknowledgment:** Graphic help from Jason Gomes

***References:***

*[1] https://www.irishtimes.com/culture/is-fighting-in-our-genes-a-biological-theory-of-warfare-1.3505451*
*[2] https://www.dw.com/en/hydrogen-vs-atomic-bomb-whats-the-difference/a-40343297*
*[3] What Is the Difference Between a Hydrogen Bomb and an Atomic Bomb? https://www.trumanlibrary.gov/public/2019-10*
*[4] https://www.sipri.org/media/press-release/2024/role-nuclear-weapons-grows-geopolitical-relations-deteriorate-new-sipri-yearbook-out-now*
*[5] https://www.cdc.gov/nceh/radiation/emergencies/nuclearfaq.htm.*
*[6] https://www.wired.com/2007/09/dirty-bomb-what/*
*[7] https://outrider.org/nuclear-weapons/articles/what-are-tactical-nuclear-weapons-international-security-expert-explains*
*[8] https://www.icanw.org/nuclear_arsenals*
*[9] https://www.cdc.gov/radiation-emergencies/media/pdfs/infographics/Infographic_Nuclear_Weapon.pdf*
*[10] https://www.ready.marines.mil/Stay-Informed/Terrorism-and-Active-Shooter/Nuclear-Blasts/*
*[11] https://www.cdc.gov/nceh/radiation/emergencies/dirtybombs.htm*

# Reflection On This Year's US Election

**David Rodrick**

By the time you will read this essay, the US have a new president elected. Every four years, especially towards the end until the first Tuesday of November, we see a lot of interest among the general population about this presidential election. A few fun facts about the election. First, the election is held on the Tuesday after the first Monday of November. Thus, essentially, the election day falls between November 2 and November 8. Second, the election year is an even year. Since 1848, all US presidential elections have been held every four years! Third, many other federal, state, and local government officials are also elected on this day due to their own schedule. You can imagine that this requires a massive, structured system to accomplish many objectives in one endeavor for convenience and cost savings. Fourth, the election process is highly decentralized, meaning state law governs the elections not the federal government. Fifth, a presidential candidate (and the vice-presidential candidate) is elected based on the electoral vote, not the popular vote! This is a unique concept. It is a 'winner takes it all' for most states. Thus, if a candidate gets the majority votes, she gets all the electoral votes kept for this state. Basically, it will require the candidate to be popular in most states along with 2/3 states with most electoral votes. Finally, often times, issues that require mandates from people, are also included in the ballot so that people can express their opinions. There are many other unique features if you look in the details. But we will keep them for another day.

I was one of the early voters. A week before the election day, I took my daughter to a local election polling center. One idea was to show her the interest and enthusiasm of people around the election. On our way to the polling station, I picked up voting guides from both the Democratic and Republican party folks who were standing outside the center helping the voters. I'm glad that I picked up both party's voting guides. They actually helped me picking up my preferred candidates who were lined up in the ballot.

But first, there was one interesting incident that caught me in the polling center. I was guided to a polling officer who verified me as a voter. She asked me my name. I registered with the state database as a voter. So, when she found my name, she asked me to tell her my birth date and home address for verification. Once verified, she gave

me a piece of paper to sign. After all parties signed, I took the paper and stood in the line for paper-based voting. There was another line for electronic voting. So, in the line, while waiting, I was thinking about the verification process. They didn't ask for a photo identification. Which means, any other guy knowing my birth date and home address could have given the vote for me! I would like to think that such a thing will not happen but certainly it was not probably the best way of verifying the voters.

Nevertheless, in a few minutes, I was in one of the booths to cast my votes. There were no surprises in the guides with regard to the presidential, congress, and state house candidates. They are all partisan candidates. Casting votes for them was quite easy. Then came the fun part. When it comes to voting for circuit court judges, both party guides suggested to vote for the same four candidates. Same scenario for three appellate court judges. Contrary to the popular belief, these parties, indeed, agree on things that are nonpartisan! Have you ever heard of such a thing? Are they out of their minds? Maybe these folks don't have very strong consciousness or ideal that some folks in other parts of the world possess? This is debatable, but I really felt very good that albeit all the differences, and heated and acrimonious campaign, they can agree on other things that matter to general people. After all, it is not about a party or a person, it is about people!

I also voted on two issues. One was on state constitution amendment on reproductive freedom. And the other was a county charter amendment to limit county executive to two terms from three terms. I voted for each issue the way I felt that they should be.

Now, why am I writing theses? This concept of agreeing with differences, and with a lot of differences, is an important concept. It keeps the country and people intact and we move forward. Is it always the case? Probably not. I have seen people disagree, often on silly matters, and they cut off their association with each other on those disagreements. Their children stop interacting with each other. We basically try to isolate or oust each other from the community – not just the individual but the whole family and if possible, their extended families. We are so emotional and angry that we stop seeing each other's faces for years! We do all these impactful things just because we disagreed on some silly issues. This is probably not a healthy practice for the community, especially a small community. We must remember what legacy we are giving to our children for them to carry on and pass them to their children.

Getting to know about what general people prefer is also important for our community leaders. This way, a community organization and its activities will truly reflect the needs and expectations of the community. I hope we all think and act to maintain a healthy community and ensure wellbeing of its members.

# মিলিনিয়াম সমাবর্তন

রেহানা কুদ্দুছ শিখা

বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলো আমার কাছে এক মধুর স্মৃতির ভান্ডার যা আমাকে বার বার ফিরিয়ে নিয়ে যায়। জীবনের সেরা দিনগুলোর এক বিশেষ সময় যা চাইলেই পাওয়া যায়না। আমাদের প্রথম দিনের ক্লাস এ সবচাইতে রাগী যে শিক্ষক ক্লাস নিয়েছিলেন, বলছিলেন তোমরা নদী থেকে সমুদ্রে এসে পড়েছো, এই সমুদ্র কিভাবে পারি দিবে সেটাই তোমাদের এখন দায়িত্ব। কথাটা শুনে খুব মন খারাপ করেছিলাম, ভাবছিলাম আমাদের জীবনটাই বোধ হয় বরবাদ হয়ে যাবে পড়াশোনা করতে করতে কিন্তু না আমাদের সেই টো টো কোম্পানির ক্লাস গ্রুপ টা এতো আতেল মার্কা ছিল না। আমরা জানতাম আনন্দ, আড্ডাবাজি আর ঘোরাঘুরি করেও কিভাবে আমাদের সেরাটা দেখাতে পারি।

আমাদের উপর শিক্ষক, শিক্ষিকারা বেশ নাখোশ ছিলেন এতো টো টো করে ঘুরে বেড়ানোর কারণে। আমরা কিন্তু কখনো ক্লাস ফাঁকি দিতাম না। ক্লাস এ উপস্থিতি ছিল ৯৫% এর মতো। আমাদের দিনগুলো ছিল এমন যে আজ মনে হলো সবাই বলে উঠলো চল সবাই চিড়িয়াখানা যাই। গেলাম বাঘ, সিংহ আর বানরের বাঁদরামি দেখতে। আর এক দিন বললো চল সবাই মিলে বুড়িগঙ্গার পাশে আহসান মঞ্জিলের জাদুঘরে নবাবদের নবাবীখানা দেখে আসি, যেমন বলা তেমন কাজ। একদিন ছুটে গেলাম সুউচ্চ নগরভবন এর ছাদ থেকে পুরোনো ঢাকা কে দেখার জন্য। একদিন আমি বললাম আমি না কোনোদিন ফেরিঘাটে কিভাবে ফেরি পারাপার হয় দেখি নাই। হায়রে আর বলতে, সাথে সাথে প্ল্যান হয়ে গেলো। আমাদের বিশাল গ্রুপ কে বলা হলো কে কে যাবে। সবাই রাজি এককথায়। বরাবরের মতো ক্লাস ৫০ মিনিটের জায়গায় আমরা ৩০ মিনিট করলাম। এটা একটু দূরে পাবলিক বাস এ করে গেলাম পরে দাউদকান্তি ব্রিজ পার হলাম পায়ে হেটে। এত বড় একটা ব্রিজ আমরা কিভাবে হেটে পার হলাম আমি চিন্তাই করতে পারিনা। প্রচন্ড ক্ষুধায় ব্রিজ এর পাশে একটা টং এ দেখলাম মাছি ভোঁ ভোঁ করা ভাত, ডাল, মাছ বিক্রি হচ্ছে। আমাদের মন খারাপকে কেউ কোনো পাত্তাই দিল না, বললো বাঁচতে চাও খেয়ে নাউ। এই ছোট ছোট পাগলামি গুলো ছিল আমাদের আনন্দ আর শক্তির জ্বালানি।

কিভাবে যে দেখতে দেখতে ৫ টি বছর পার করে দিলাম। মাস্টার্স পরীক্ষার আর কয়েক দিন বাকি, বেশিদিন আর ক্লাস করতে হবে না। ক্লাসের সবার মন খারাপ। আমাদের এক ক্লাস ফ্রেন্ড টিচারদের বলছিলো, স্যার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দিচ্ছেন, আমরাতো আরো থাকতে চাই। স্যার বলছিলেন যত তাড়াতাড়ি তোমরা পাশ করে বেরুবে তত তাড়াতাড়ি চাকরি পাবা। তোমাদের তো খুশি থাকা উচিত। কিন্তু না খুশি হতে পারলাম না। এর পর আসলো আমাদের সেই সেরা সময়ের একটি। হঠাৎ শুনতে পাই এই প্রথম স্বাধীনতার পর সব অনুষদের গ্রাডুয়েশন সমাবর্তন। ভারত থেকে নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনকে প্রধান অতিথি করে আনা হবে। সময়টা ছিল ২০০০ সাল। আমরা বিস্ময়ে হতভম্ব, আমরা যে এতটা সুভাগ্য প্রসন্ন, ভাবা যায়! শুধুমাত্র আমাদের ব্যাচ আর শিক্ষক, শিক্ষিকারা অমর্ত্য সেনের কাছ থেকে সনদ, মেডেল নেয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমাদের খুশি আর আনন্দের শেষ ছিল না। আমাদের সমাবর্তন এর আগের দিন সবাইকে জমায়েত করে হলো কালো গাউন পরে রিহার্সাল দিতে, কোথায় বসতে হবে, কোথায় হাটতে হবে দেখানোর জন্য। মিলিনিয়াম সমাবর্তন শুধু আমরাই পেয়েছি স্বাধীনতার পর এই প্রথম সব অনুষদের আমাদের ব্যাচের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা তো ছিলই, স্কুল ও কলেজ এর বন্ধুদের সাথেও আমরা কালো গাউন, মাথায় হেট দিয়ে কত রকম পোজ দিয়ে ছবি তুললাম। আমাদের প্রোগ্রামটা ছিল সারাদিনের। মজার ব্যাপার আমরা শুধু ফটোসেশন করেই অর্ধেক বেলা পার করে দিলাম, আরেকটু দেরি হলে অমর্ত্য সেনের বক্তৃতা মিস করতাম। এর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছরই ধারাবাহিকভাবে এতো বড় পরিসরে সমাবর্তন আয়োজিত হয়, এর আগে শুধু বিভাগ থেকে ছোট করে হতো।

আমাকে যদি টাইম ট্রাভেল মেশিন দিয়ে অতীতে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হতো আমি নিশ্চিতভাবে আমার সেই প্রিয় সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোনালী দিনগুলোতে ফিরে যেতে চাইতাম।

# How Atoms Work

**Jaser Kuddus**

Have you ever looked at a periodic table and wondered what all the letters and numbers mean and what they have to do with atoms? Everything in a periodic table has an important aspect in identifying change using certain elements. Each element has a symbol, which is the big letters in the middle of each box. The symbol always starts with an uppercase letter, then the rest of the letters are lowercase. For example, Helium's symbol is "He". Some symbols are meant to be the letters of different names for an element. For example, Gold is "Au", because Gold in Latin is Aurum.

There are 3 things that make up an atom, which are protons, electrons, and neutrons. These are called subatomic Particles. Protons are positively charged, electrons are negatively charged, and neutrons don't have a charge. Protons and neutrons make a clump in the middle of an atom, called the nucleus. Electrons stay in an area around the nucleus called the electron cloud. In one of the boxes in the periodic table, above the symbol is a number called the atomic number. The atomic number is the amount of protons and electrons an atom has. The periodic table is ordered by the atomic number of each element. The number under the symbol is the atomic mass and you can use it to figure out the amount of neutrons an atom has. First, round the atomic mass to the first whole number. Then subtract the atomic mass by the atomic number. The result you get is the amount of neutrons an atom has.

There are always electrons on the outer edge of the electron cloud, called valence electrons. These electrons help atoms bond with other atoms. At first, if there can be a maximum of 2 valence electrons, and when it goes over, the amount of velence electrons resets and there are more electrons on the inside of the electron cloud. Then there can be a maximum of 8 valence electrons and if the amount of electrons goes over 8, then there are more inner electrons, and the amount of valence electrons resets. In the periodic table, each row is the number of times the valence electrons reset and each column is the number of valence electrons that the atom has.

For example, Oxygen has an atomic number of 8, an atomic mass of 15.99999, and its symbol is "O". We can determine that it has 8 protons and electrons. If we round 15.999999 to the nearest whole number, we get 16. Sixteen minus eight is eight so Oxegen has 8 neutrons. It has 6 valence electrons and 2 inner electrons because the first reset starts at 2, so there are 6 left over.

You can change the amount of protons, neutrons, and electrons that are in an atom. If

you change the amount of protons, then the element changes. If you change the number of neutrons it has, it becomes an isotope. If you lower the amount of electrons it has, it becomes a positive ion because it has more protons than electrons. If you increase the amount of electrons it has, then it becomes a negative ion because it has fewer protons than electrons.

Electrons of the atom are negatively charged and they are in what scientists call shells. They orbit around the nucleus of the atom, which contains the neutron and protons. As electrons are negatively charged, they are attracted to positively charged things. Which in this case is the proton. The electrons can hop from one shell to another. When they do that, the atom is in an excited state. That is what causes the fireworks we see on July Fourth. There are more than 90 atoms that exist in nature. Other atoms that don't exist in nature are man-made. Scientists can create atoms with different amounts of protons, forming a new element. Some of the new atoms scientists make have super short half-lives, so they are unable to observe the new atom. They can also add a proton to an atom, transforming it into an element like gold. However, the cost of this process often exceeds the actual value of gold, making it pointless. We interact with atoms no matter what we do, because even we are made up of atoms. If atoms didn't exist at all, our world would just be space.

# শিরোনামহীন

## ড. আমীনুর রহমান

আমাদের ঘরের টিনের রপালি চালে বলবান দুটো কাঁঠালিচাঁপা উঠেছিল
বছর চারেক ধরে, লতিয়ে গড়িয়ে হাত ধরাধরি করে।
তাদের জড়াজড়ি মায়া ছিল দেখার মত,
পাতায় ফুলে কাণ্ডে গলাগলি ভাব,
ছায়াদের ছোঁয়াছুঁয়ি সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি
সামান্য বাতাসেই বুকে জড়িয়ে ধরে শাখারা পাতাদেরকে।

আমাদের বিছানা বালিশে, শীতল পাটিতে কাঁঠালি চাঁপারা
আদরে মেখে দেয় আতরের ঘ্রাণ;
পকেট ভর্তি কাঁঠালি চাঁপার প্রাণ
প্রেমিকার চিঠির মত যত্নে সাজিয়ে স্কুলে যাই।
বন্ধুরা গা ঘেঁসে বসে বলে, তোদের বাড়িতে কি বাগদাদি খুশবু আছে?

বৃষ্টি এলে কাঁঠালিচাঁপা ধোয়া বাসনা জল গড়াত টিনের চাল থেকে
জানালা কপাটে লেগে থাকা ছিটেফোঁটাতে সুবাসের কমতি হতো না।
আমার শ্যামলা দিদিকে ফিসফিসিয়ে মা বলতেন,
কাঁঠালিচাঁপা ধোয়া পানিতে মুখে ঝাপটা দে বার কয়েক,
মেখে নে খানিকটা ঘাড়ে গলায়, রঙটা খুলবে,
আশ্বিনেই তোকে দেখতে আসবে, চুলেও খানিকটা মাখিস
দেখবি দু' মাসেই কোমর ছড়িয়ে নামবে,
এবার যেন সব ভালয় ভালয় হয়।

আমার বোন ঘাড়ে গলায় মুখে পানির ঝাপটা দিত না,
চুলেও মাখত না এক ফোঁটা
শুধু বালুচুড়ি শাড়ির আঁচল গলায় পেঁচিয়ে
জানলায় বসে নির্নিমেষ জল গড়ানো দেখতে দেখতে
আমাকে বলত, যা তো, ঝরে পড়া ফুলগুলো কুড়িয়ে আন, খোঁপায় গুঁজবো।

# When Poets Meet

## Avik Sanwar Rahman

It's a world that turns around on its feet
Heart touching heart
Love is in the air
No more war!
A poet's adda
With coffee and cha'
Time heated and cooled
With them
Stirring cup rolls up line 'save the world!'
Oh, poets! play with your spoon
Feed the world with verses
Once a Pan-Arab poetry festival
Forbidden killing for the sake of poems
When poets meet
People rise on the street!

# অজাগ্রত আমি

## ড. আফজাল চৌধুরী

বিবেক আমার, সেতো বন্দি
আমি অন্ধ, আমি পাষান, আমাকে বুঝিও না তো,
আমি  অজাগ্রত;
একবার জাগ্রত হয়ে দেখো না,
আত্মা শান্তি পাবে;
না, আমার আত্মা শুকিয়ে গেছে,
এক ফোটা জলও যে নাই চোখে;
আমি ব্যর্থ,পারিনি জাগাতে আমার সীমারকে
ধিক এ জীবন, ধিক আমার এই অন্ধপনা
আমি ক্ষমারও যোগ্য নই।

# টিমটিমে রং

## অদিতি সাদিয়া রহমান

বড্ড একা, দিন থেকে রাত
সকাল বেলা টোস্ট বিস্কুট
রাতে কেবল, আরশোলটার
পাখনা মেলে উড়তে চাওয়া।

মিষ্টি বেলী ফুলের হঠাৎ,
দমকা হওয়া,
গরম ভাতে লাল লঙ্কা,
নুন আর পেঁয়াজ
হারিকেনের টিমটিমে রং
নিম আলোতে পা ফোঁসকে
পড়াই সড়াৎ।

সকাল সকাল ছাতা হাতে
ব্যাগ ঝুলিয়ে, পা লেংচে,
ঝুলতে ঝুলতে, কাজে ঢোকা
বিরতিতে দু'চুকে গরম চায়ে
ফুয়ে ফুয়ে মনটা মাতা।

নীল আকাশে, চোখের কোনে
স্বপ্ন আঁকা, স্বপ্ন আঁকা
মেঘের পেটে স্বপ্ন গুলো
গপাশ করে ঢুকে যাওয়া,
আর না পাওয়া।
তবু তো হায় দিন থেকে রাত
রাত থেকে দিন
চালের ফুটো, দু চার ফোঁটা
বৃষ্টি কণা, পেটে পাথর,
মনটা তবু  দিন থেকে রাত
দিক হারানো খড়কুটো
আর  রাজপুত্রের গল্প শোনা।

রং যতটাই ক্যানভাসে দেয়
টিমটিমে রং টিমটিমিয়েই
জ্বলতে থাকে, জ্বলতে থাকে।
তাইতো আমার দিন থেকে রাত
এমনি করেই চলতে থাকে।।

# কান্নার দিন

## অদিতি সাদিয়া রহমান

আজ সারাদিন আমার বৃষ্টি ভেজা
কান্নার দিন
যেমন এখন পালন করি ভ্যালেনটাইন এর দিন
যেমন পালন করি মা দিবস
যেমন পালন করি
মেয়ে,ছেলে,নারী দিবস
ঠিক তেমনি
কত রক্তাক্ত লেখনী বুকের পাঁজরে
পা টিপে টিপে হেঁটে বেড়ায়!
সহানুভূতি হীন এই লাল লেখা
আলতো স্পর্শে আজ ম্লান এর দিন।
আজ আমার একান্তে বসে,
কান্নার দিন।।

## অসময়ে মৃত্যু ভাবনা

### শাহনাজ রহমান ফারুক (শিরীন)

না, না, এ হবেনা, হবেনা তুমি চলে যাও, এদিকে আসবেনা
তোমার আগমনে আমি হাসবো না, আমি বাঁশী বাজাব না
চলে যাও, দু'হাত জোড় করে বলছি চলে যাও, চলে যাও
তোমার কি ক্ষতি করেছি;অকালে কেন বেসুরে বাঁশী বাজাও?

চারিদিকে কেন এত ঘুরপাক খাও; বলছি তো তুমি চলে যাও
আমার চিন্তা চেতনা হতে দুর হও; অনেক দুরে চলে যাও
তুমি কি জান না; আমার আর ও একটু সময়ের প্রয়োজন
আমাকে ওরা যেতে দেবেনা, ওদের ভালবাসায় অম্লান রব।

জীবনকে ভালবেসেছি; জীবনের প্রতিটি বাঁকের মাঝে
রইবে আমার ছোঁয়া; রেখে যেতে চাই
প্রতিটি অক্ষরের মাঝে কিছু অসাধারন,
কিছু অলৌকিক অনুভূতি, সব সীমানা
পেরিয়ে অসীমের মাঝে হারানোর এক ভৌতিক কল্পকাহিনী।

দুরে দাঁড়িয়ে যে একটু দেখ; একটু সময় নাও; মিনতি করছি
জানি বিশাল কর্মযজ্ঞ তোমার; কিন্ত আমার ও তো কাজ ফুরোয়নি!
একটু দয়া করো এতটা নিষ্ঠুর হয়ো না আজ
আমার এখনও বাকী অনেক কাজ; অনেক কাজ!

এখনও ওরা মানুষ হয়নি; ওরা এখনও নির্বোধের মত অকাজে ব্যস্ত;
ওদের বলে দাও শান্তির পতাকা উড়িয়ে আসছি;
এবারে আশাহীনরা হবে আশার আলোয় দীপ্ত।
আগুনের লেলিহান শিখা জালিয়ে হয়ো না আজ ক্ষীপ্ত!

## ভালবাসার কতকথা

### শাহনাজ রহমান ফারুক (শিরীন)

তোমার কবিতা পড়ে আজ মন হারিয়ে গেল;
যেখানে হারানো আর সমীচিন নয়।
অচেতনভাবে বন্দী করা কষ্টগুলো
আবার অকারনে জীবন্ত হলে;
আমি তো বেশ আছি, এই সুখের সংসারে;
তবে কেন অসময়ে তুমি হৃদয়ে নাড়া দিলে?
সত্যি প্রেম বোধ হয় কি তবে কখনও মরে না?
জোর করে কি মৃত কাহিনীর সমাধি তৈরী করা যায় না?
মনকে যতই বোঝাই সে শুধু বলে শান্ত হও!
ওসব মনে করে আর কষ্ট পেয়ে কি লাভ;
এবেলায় ওটাকে জীবনের অলিখিত
ইতিহাসের পাতায় রেখে দাও!
আমি যে সুখের মাঝে কষ্ট ভালবাসি;
কষ্টের পাহাড় বেয়ে অনেক উপরে উঠি;
সেইখানে মেঘের সাথে অনেক লুকোচরি খেলি;
কখন যে বিদ্যুতের আচমকা আঘাতে মৃদু টিপটিপ
কখন বা মুষলধারায় বৃষ্টি নেমে আসে।
এভাবেই কিছু নীরব মুহুর্তগুলো কেটে যায়;
এরই নাম জীবনের কিছু অসমাপ্ত অধ্যায়।

# তেত্রিশ বছর পরে

সোনালী দাস

ঠিক তেত্রিশ বছর পরে, যখন বন্ধু এল ঘরে,
খুশির বানে মনটা মোদের উথাল পাথাল করে।
বলি দুঃখ-সুখের কথা,
এই হৃদয়ে ছিল যা গাঁথা,
বলতে বলতে ডুবে যাই সেই অতীতের স্মৃতিঘোরে;
ছায়াছবি সম ফিরে আসে সব তেত্রিশ বছর পরে।
সেই যে স্কুল-কলেজের পরে,
উচ্চশিক্ষার তরে,
সাতটা বছর কাটিয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে,
সেটাই ছিল সুবর্ণকাল জীবনের এক অধ্যায়ে।
বলি সেই কলাভবনের কথা,
পাশে মধুরক্যান্টিন যেথা,
রোজ সকালে ছুটতাম ক্লাসে খুব তড়িঘড়ি করে;
সুযোগ পেলেই বলতাম যত, আজ সব মনে পড়ে।
মেয়েদের সে হলের পাশে,
দেয়ালে মাধবীলতারা হেসে
ঝুলে ঝুলে কত বলত কথা চুলের বেণিটা টেনে!
লাল-গোলাপি মিষ্টি-ঠোঁটে হাসত ফুলেরা শুনে।
মনগুলো ছিল সবুজঘেরা,
যেন উচ্ছল সাগরধারা,
যৌবন-স্রোতে ছুটে বেড়াত সাহসের তরি বেয়ে;
দেখে জারুল, বকুল, কৃষ্ণচূড়াও হাসত চেয়ে চেয়ে।
আন্দোলন আর সেশনজটে,
সাতটা বছর গেল কেটে,
পড়ার শেষে জড়িয়ে গেলাম পেশা ও সংসারে;
আর হন্যে হয়ে ছুটছি সবে অধরা সুখের তরে।

ছিন্নমালার পুঁতির মতো,
ছড়িয়ে গেল বন্ধু যত,
শহরে-গ্রামে, দেশে-বিদেশে জীবনের প্রয়োজনে;
ঢাকা পড়ে যায় পেছনের যত নতুনের আয়োজনে।
আজ বন্ধুর হাতে রেখে হাত,
পেলাম যে এক নতুনের স্বাদ,
বুঝতে পারি, বদলে গেছে সে উচ্ছলতার ঘোর;
পাওয়াগুলো শুধু যায় পিছিয়ে, সামনে নতুন ভোর।
বছরগুলো ঘুরে ঘুরে,
ভাসছি এখন ষাটের ঘরে,
বাল্য, কৈশোর, যৌবন নয়- এক নতুন সাগরতীরে;
মোরা নব-হেমন্তে গাইছি যে গান রঙিন পাতার সুরে।
হে প্রিয় বিদ্যাপীঠ!
ভালো থেকো তুমি, ভুলব না যতদিন থাকি এই ভবে,
ভালো থেকো অগ্রজ, অনুজ সহপাঠী মোর বন্ধুরা সবে!

# An Old Story

## Shirleen Selim

Once there was a town
Small, but with big dreams,
A fierce and mighty mask to the world.
An alien sky hovers above,
And the grasses watch.
It is a land of legend
That it wrote for itself.
A black seed at the center,
All eyes focused.
Like an amoeba, the seed moves,
and all the eyes with it.
It cannot escape.
The seed will never grow, never germinate.
They will see to it.
The alien sky above, the grasses below.
Moons casting light, but the town
enveloped in secret darkness.
A mask of ancient blood,
From another land.
Irony of the face beneath.
Named by a game of numbers.
A legend that everyone knows.
How wonderful the tale.
How magnificent the sentiment.
The seed died again.
Now the sky and the grasses watch.
Above and below.
The mask will become the face.
Blood stains.

*On the occasion of the auspicious* DUAFI *Reunion, I wish everyone the very best for a successful and memorable event.*

## Dr. Mizanur Rahman

ডুয়াফি বোর্ড ও প্রতিটি সদস্যের জন্য আমাদের প্রানঢালা শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইলো। সুন্দর ও সফল হোক বর্তমান, সুন্দর হোক ভবিষ্যতের সব উদ্যোগ।

## শাহনাজ ফারুক ও কামেল হক

5151 Lee Highway, Arlington, VA-22207
Phone : (703)-973-2432, www.gharerkhabar.com

# DESHI BAZAR

A Bangladeshi Grocery store in town now has a wide collection of Men's and Women's Dresses, Cosmetics, Perfumes, Electronic and Electric Accessories for your convenience and easy access.

Come, See and Shop Now!!!

Gaitherstowne Plaza
282 N Frederick Ave, Gaithersburg, MD 20877
Phone: (301) 963-4418 http://www.deshibazarmd.com

# Inauguration 2023-2024

# Inauguration 2023-2024

# Appreciation Party 2023

# DCEA Ekushey Observance 2023

# DCEA Ekushey Observance 2023

# DCEA Ekushey Observance 2023

# DUAFI Celebrated the Life and Works of Late Dr. Nurul Islam

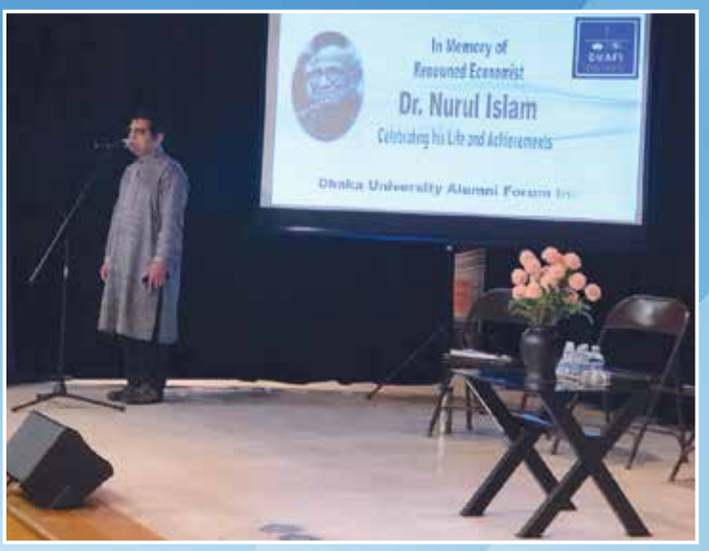

## ডুয়াফি'র আয়োজনে ড. আশরাফ আহমেদ এর দু'টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন
## "বাংলা সাহিত্যের প্রথম কল্পবিজ্ঞান লেখক বেগম রোকেয়া"
## "রোমান সাম্রাজ্যের বর্তমান ও অতীত"

## ডুয়াফি'র আয়োজনে আহসান কবিরের নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন
## "রোদ্দুরে শোকের ছায়া"

## ডুয়াফি'র আয়োজনে আনিস আহমেদের নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন
## "কতকথা কথকতা"

# DUAFI Participated at DC Boimela 2023

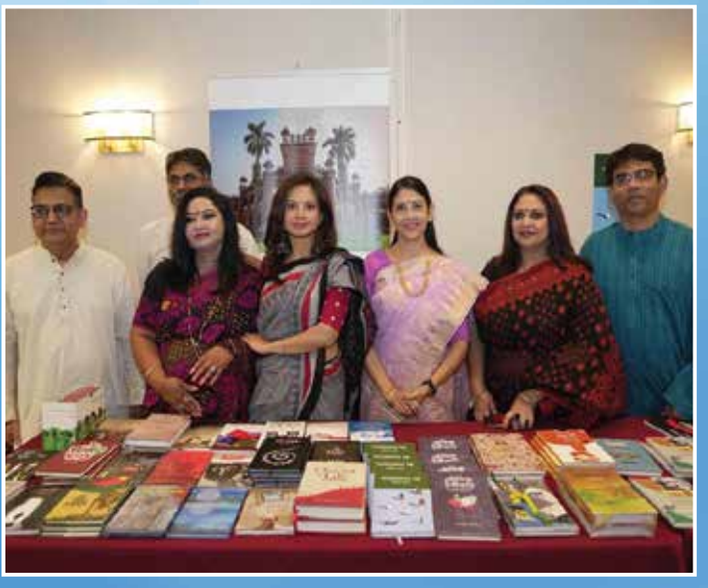

# DUAFI Participated at DC Boimela 2023

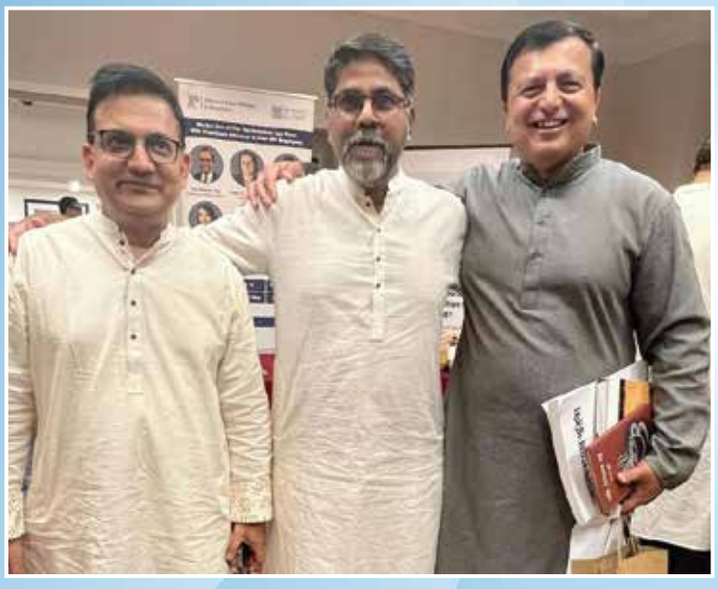

# Picnic 2023

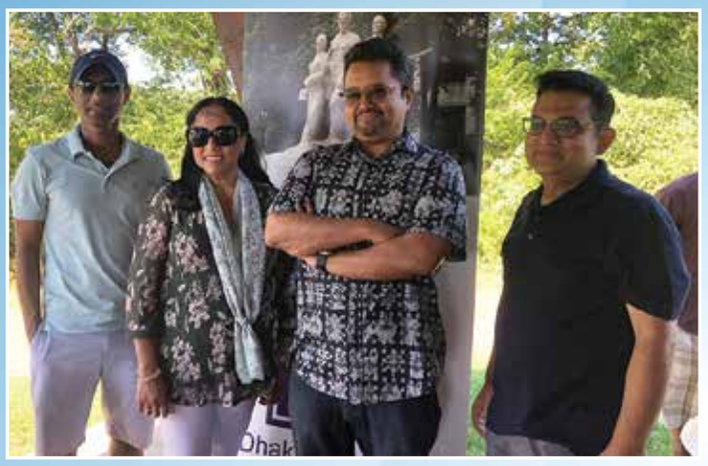

# Picnic 2023

# DUAFI Annual Cultural Show 2023

# DUAFI Annual Cultural Show 2023

# Picnic 2024

# Picnic 2024

# DUAFI Reunion Program 2024- Rehearsal

# DUAFI Reunion Program 2024- Rehearsal

# Painting by Young Artists of DUAFI Family

Shirleen Selim

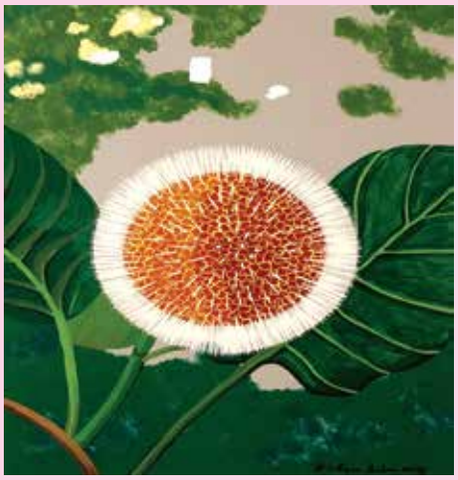

Shoummo 9 years, Sohem 6 years

# আলোকচিত্রে স্মৃতিময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

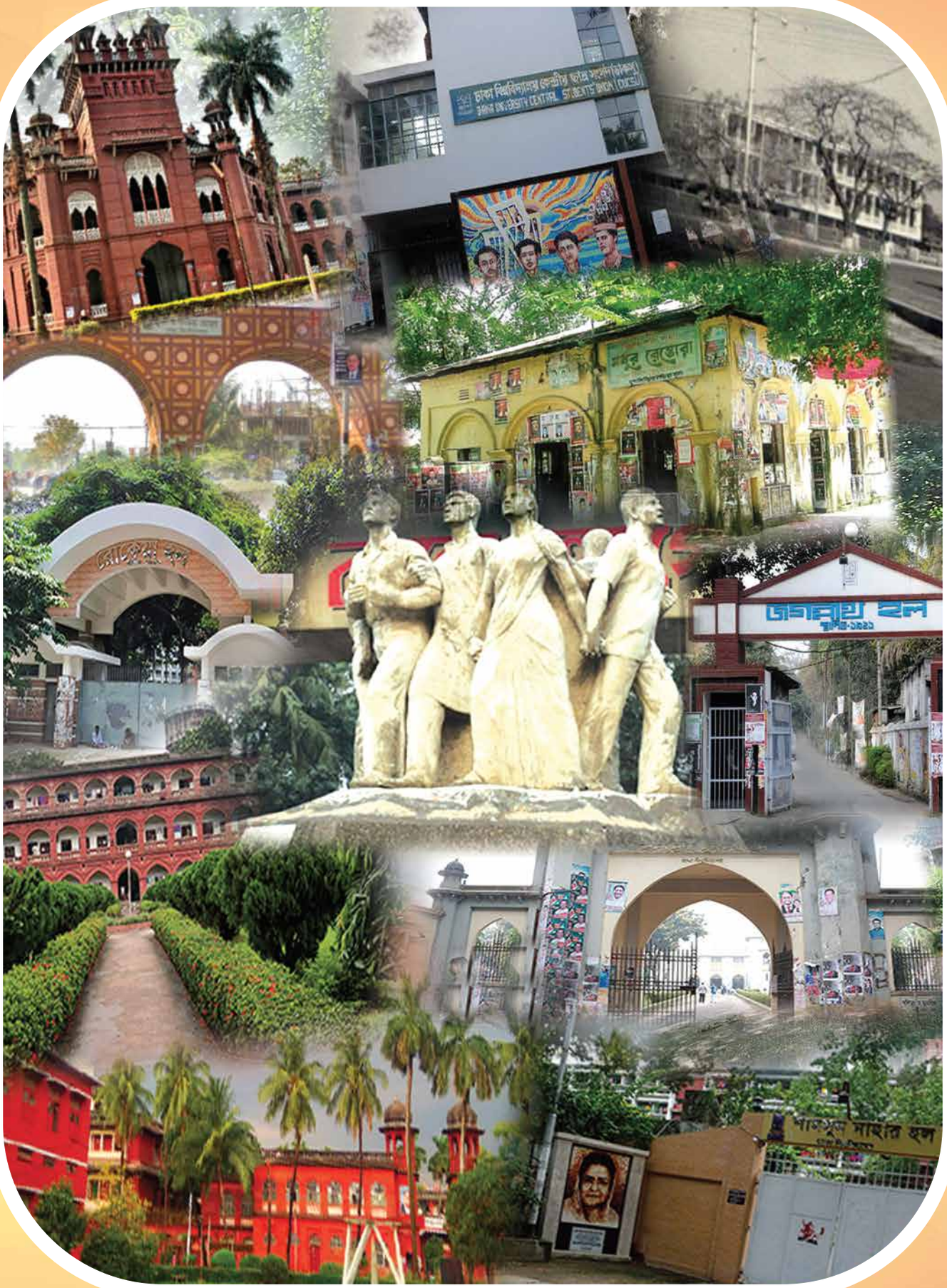

# Note of Thanks

On behalf of the Board of Directors of the Dhaka University Alumni Forum, Inc. (DUAFI), we extend our heartfelt thanks and deepest gratitude to each one of you who contributed to making our Bi-Annual Reunion a tremendous success.

Your unwavering support, dedication, and enthusiasm were the driving forces behind this memorable event. From the inspiring contributions of our writers for our publication "Oikotan" to the generous sponsorships, from the tireless efforts of our volunteers to the outstanding performances of our performers- your involvement made the reunion not only a grand success but a celebration of our shared history and community.

As we look ahead, we are excited to continue fostering the strong bonds within our DUAFI family. Together, we will continue to strengthen therelationship to build avibrant and connected alumni network for the years to come.

As we approach the upcoming holiday season, we wish you all continued happiness, success, and prosperity in the times ahead.

Once again, thank you for your exceptional support and commitment.

**The Board of Directors**

**Dhaka University Alumni Forum, Inc. (DUAFI)**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই ফোরাম, ইন্‌ক এর দ্বিবার্ষিক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের এই আনন্দঘন মুহূর্তে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমাদের তরুণ প্রজন্মকে ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির সংস্পর্শে গড়ে তুলতে হবে শেকড়ের সম্পৃক্ততায়। সেই প্রত্যাশা এবং প্রত্যয়েই বাংলা স্কুলের এই স্বপ্নীল অভিযাত্রা! আপনাদের সহযোগিতাই আমাদের শক্তি।

BancStar



# MORTGAGE!

**NO TENSION. LIVE THE DREAM OF HOME OWNERSHIP**

## FREE! Mortgage Consultation TODAY!

In-home closing service in DC-MD-VA

You can complete the paperwork in the comfort of your own home and leave the driving to us! We will make your settlement experience easier.

Ask me how?

**Rob Garagusi**
NMLS #170077,
BancStar Mortgage LLC NMLS # 166208

**Office : (240) 644-6243**
**Cell : (301) 346-6471**
Email: Office **rgaragusi@bancstarmortgage.com**

**8120 Woodmont Avenue, # 830, Bethesda, MD-20814**

# YOUR FRIEND.
# YOUR NEIGHBORHOOD REALTOR®.

Nazir Ullah

*The name you can trust with confidence.*

## Nazir Ullah gets the results that you want whether buying, selling, or investing in residential property.


LONG & FOSTER® REAL ESTATE

C: 301-537-9885
O: 301-424-0900
E: Nazir.Ullah@LongandFoster.com
W: NazirUllah.LNF.com


Top Producer | Multi-million Dollar Producer
Licensed in MD, VA, & DC | Over 20 Years Experience
Many Happy Clients!

Long & Foster Rockville Centre | 795 Rockville Pike | Rockville, MD 20852


If your property is currently listed with another broker, this is not intended as a solicitation.